مِلَّة إبراهيم

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ

“এবং যে নিজেকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইব্‌রাহীমের (আঃ) দ্বীন হতে বিমুখ হবে?”
(সূরা বাকারা: ১৩০)

মিল্লাতে ইব্‌রাহীম

(ইব্‌রাহীম (আঃ) - এর দ্বীন)

এবং নবী ও রসুলদের দা’ওয়াহ (ডাক)

এবং একে ধ্বংস করতে ও দা’য়ীদের এই মিল্লাত থেকে সরিয়ে নিতে তাগুতদের নেয়া কিছু পদক্ষেপের বর্ণনা

ودعوة الأنبياء والمرسلين
وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها

لأبي محمد عاصم المقدسي

আবু মুহাম্মাদ ’আসিম আল-মাকদিসি
(আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুক)

আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স

মিল্লাতে ইব্‌রাহীম

(ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দ্বীন)

এবং নবী ও রাসূলদের দা'ওয়াহ

এবং একে ধ্বংস করতে ও দা'য়ীদের এই মিল্লাত থেকে সরিয়ে নিতে ত্বগুতদের কিছু পদক্ষেপের বর্ণনা

আবু মুহাম্মাদ 'আসিম আল-মাক্‌দিসী

(আল্লাহ্ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুক)

আত্‌-তিবয়ান পাবলিকেশন্‌স -এর পক্ষ হতে বিতরণ সংক্রান্ত বিশেষ অনুরোধ ঃ প্রকাশকের টীকাসহ এই গ্রন্থের সকল অংশে যে কোন প্রকার- যোগ-বিয়োগ, বাড়ানো-কমানো অথবা পরিবর্তন করা যাবে না, এই শর্তে, যে কোন ব্যক্তি এই প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার অধিকার রাখেন ।

সূচী পত্র

"চরম পত্র" ৬

ভূমিকা..... .... ৮

অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের বর্ণনা সম্পর্কিত ২৫

অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমে অটল থাকার দুঃসাধ্যতা এবং ভ্রান্ত পথ অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি সতর্কবাণী ৫৭

অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমে অটল থাকার ব্যাপারে দায়ীত্বসমূহ.....৬১

অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমকে ধ্বংস করতে এবং দা'য়ীদের এই মিল্লাত থেকে সরিয়ে নিতে ত্বগুতী কার্যক্রমের কিছু পদ্ধতি.......... ৯৭

"চরম পত্র"

হে ত্বগুতের দল (অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী শাসকগোষ্ঠী)! হতে পারে তুমি আজকের ত্বগুত অথবা আগামীকালের... হতে পারো তুমি কোন শাসক বা নেতা... সিজার বা কিসরা... ফিরাউন বা নমরূদ... ত্বগুতের কর্মচারী (ত্বগুতের বেতনভোগী) আলেম... তুমি হতে পারো ত্বগুতের আর্মি বা পুলিশ বা কোন গোয়েন্দা সংস্থার লোক; তোমাদের সবাইকে বলছি, শুনে রাখো...**নিঃশ্চয়ই, আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও।** (আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪) সম্পর্ক নেই তোমাদের পঁচে যাওয়া আইন বা নীতির সাথে... সম্পর্ক নেই তোমাদের সংবিধান আর মূল্যবোধের সাথে আর তোমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে। আমরা আরও বলছি, শুনে রাখো... **আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।** (আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

“যতদিন তুমি আমাকে রাখবে এই দুনিয়ায় আমি চালিয়ে যাব জিহাদ তোমার শত্রুদের সাথে,
আর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাওয়াই হবে আমার পেশা ।
তাদের (শত্রুতা) আমি প্রকাশ করে দিব সবার সামনে ।
আর (প্রতিনিয়ত) তাদের শক্তিকে খন্ড-বিখন্ড করে দিব আমার (ধারালো) কথা দ্বারা ।

ধ্বংস হোক তারা! আমার রব তো জানে
তোদের গোপন বিষয়গুলো, (আরও জানেন) তোদের অন্তরের সকল খারাবি ।
কারণ আল্লাহ তো অবশ্যই সাহায্য করবেন তাঁর দ্বীনকে ও তাঁর কিতাবকে,
আর তাঁর নবীকে, পূণ্যজ্ঞান ও শক্তির দ্বারা ।

কেউ কখনো ভাঙতে পারবে না সত্যের এই স্তম্ভ,
যদিও বা এক হয় সকল মানুষ আর জ্বীন ।”

(ইবন আল-কাইয়্যিম)

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের পরাজয় দানকারী ।

আর সালাত ও সালাম সেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর; যিনি আমাদের আদর্শ; যিনি বলতেন, "…..নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে তাঁর '*খলিল*' (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানিয়েছেন, যেমনটি তিনি বানিয়েছিলেন ইব্‌রাহীমকে (আঃ) ।"[১]

শুরুতেই বলতে চাই, আমার এই বইটি *'মিল্লাতে ইব্‌রাহীম'*, আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছে নতুন ভাবে পেশ করছি । আসলে বইটি প্রকাশ হবার আগেই কিছু সংখ্যক উদ্যমী তরুণ এর অসংখ্য কপি দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেয় । এর কারণ আমি পাকিস্তানে আমার কিছু আলজেরীয় ভাইদেরকে এর পান্ডুলিপি দিয়েছিলাম । এটা ছিল *"আসালিব আত তুগাত ফিল কায়িদ লিদ-দাওয়াহ ওয়াদ-দু'আহ"* নামক বইয়ের একটি অধ্যায় যা আমি সংকলন করছিলাম, অসম্পূর্ণ ছিল । ঐ সময় আমি বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করার কারণে এটা অসম্পূর্ণ ছিল । সে অবস্থাতেই ঐ ভাইয়েরা প্রথমবার বইটি প্রকাশ করে এবং সেভাবেই প্রচার লাভ করে ।

এরপর যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতে আমার সুযোগ এলো আমি এর প্রকাশের কাজটি সম্পূর্ণ করি । আর এই বইটির কারণে আমাকে বহুদিন ত্বগুতের ক্রোধের শিকার হয়ে জেল খাটতে হয় । শেষ পর্যন্ত তাদের ক্রোধ এতটাই চরমে পৌঁছায় যে, কোন ভাইকে এ্যারেষ্ট করলে তারা এ বইটির কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে । তাদের প্রথম প্রশ্নই হয়, "তুমি বইটি পড়েছ ? অথবা তুমি কি এর লেখককে চেন ?"

এই প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে তাকে বলা হয়, "এটাই (প্রমাণ হিসেবে) যথেষ্ট । এর মানে তুমি জিহাদী চিন্তার মানুষ । নিশ্চয়ই তোমার কাছে অস্ত্র আছে । কারণ আমরা যত সন্ত্রাসী গ্রুপকে ধরেছি সবার কাছেই এই বই ছিল ।"

তাই আবারও সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি এ বই তাদের গলার কাটা বানিয়েছেন, এ বই তাদের মাথার ব্যথা আর লিভারে আলসার । আর আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই এবং তুমি এই সব ত্বগুতদের পাকড়াও কর *সা'দান* (আঙটা আকৃতির কাঁটা) দ্বারা ।

বইটি পুনঃপ্রকাশের আগে সময় নেয়ার অন্যতম একটি কারণ ছিল এই যে, আমি চেয়েছিলাম পাঠকদের মতামত উপদেশগুলো বিবেচনা করতে । আমার সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল ঐসব লোকদের মন্তব্যের ব্যাপারে যা সবসময় এই দাওয়াহ ও এই বইয়ের বিরোধিতা করার জন্য হা করে থাকে; কিছু একটা বিরোধিতা না করতে পারলে এদের মুখ চুলকাতে থাকে । এরা বলেছে, আমাদের মুখ দিয়ে নাকি এমন কথা বেরিয়েছে যা পূর্বে কখনো বের হয়নি; এটা একটি মিথ্যা কথা । এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে জুমআর খুৎবাও দিয়ে ফেলেছেন ।

[১] মুসলিমে বর্ণিত হাদিস । জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, হাদিসটি 'মারফু' ।

কুয়েতের এক মসজিদের এই খতিব সাহেব বলেছেন, আমি নাকি বলেছি যে এই যুগে আমিই (লেখক) একমাত্র মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের ওপর। বাকি সবাইকে নাকি আমি কাফির ঘোষণা করেছি। তিনি আমাদেরকে এ যুগের 'খাওয়ারিজ' ডেকেছেন। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছুকেই তারা মিথ্যা বলতে চায় আর বিভ্রান্ত করে সেই সব অন্ধ মানুষদের যারা তাদের অনুসরণ করে। তবে যারা সত্যের অনুসারী; হিদায়াতের আলোতে যারা পথ চলেন, তারা আমাদের ব্যাপারে জানেন এবং বোঝেন। তাইতো কবি বলেছেনঃ

'আর আল্লাহ যদি প্রচার করতে চান একটি ভালো জিনিস,
যার প্রয়োজন সবার।

তিনি তো জাগিয়ে দেন হান তার সেই বক্তাকে,
যাকে হিংসুটেরা হিংসা করে।'

এতো দীর্ঘ সময় এবং এতো অসংখ্য আগ্রাসী সমালোচকের দল থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে সত্যিকার অর্থে বড় ধরনের কোন অভিযোগ আসেনি। যা এসেছে তা ঐসব আলেমদের তোলা খুচরা কিছু বিষয়। আমি সে গুলোর সার সংক্ষেপ তুলে ধরছিঃ

- তারা বলেছেন, আমার (লেখক) ভাষ্যমতে ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মূলনীতিই হচ্ছে কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা। কিন্তু আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে প্রশংসাকারী ও সবরকারী বলেছেন। কারণ তিনি লূত (আঃ)-এর কওমের পক্ষ নিয়েছিলেন যাতে সেখানে গযব না দেয়া হয়।

- তাদের আরও একটি আশ্চর্য অভিযোগ হলো, "আমাদের পথ ও মিল্লাত হলো মুহাম্মাদ (সঃ) এর পথ। আর ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত বা শরীয়া তো এর পূর্বের শরীয়া। আর যারা পূর্বে এসেছে তাদের শরীয়া তো আমাদের জন্য নয়।"

- তারা বলেছেন, "সূরা মুমতাহিনার যে আয়াতে মিল্লাত-ই ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কথা বলা হয়েছে, সেটাতো মদীনায় নাযিল হয়েছিল, যখন দারুল ইসলাম ছিল।" তারা জোর গলায় বলছেন যে, মিল্লাতে ইব্‌রাহীম তখনই পূর্ণরূপে পালন করা যাবে যখন দারুল ইসলাম থাকবে।

- তারা আরও বলেন, "মক্কায় মূর্তি ভাঙ্গাঁর হাদীসটি একটি দুর্বল হাদীস।" এই হাদীসটিকে দুর্বল করেই যেন তারা এ বইটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করতে চায়।

আসলে এসব মামুলী যুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বইটির অসম্মান করা হবে। বিজ্ঞ পাঠকরা অন্ততঃ সেটাই ভাবছেন। কবিও বলেছেনঃ

যত সন্দেহের অস্পষ্টতা আছে
সবই তো চূর্ণ সারিবদ্ধ কাঁচের মতো।
সত্যের আগমনে এরা সবই হবে ধ্বংস।

সত্যি বলতে কি, কিছু সংখ্রক মোহাবিষ্ট বোকা ছাড়া আর সবার কাছেই এসব যুক্তির উত্তর মজুদ আছে, কারণ, এ গুলো খুবই দুর্বল যুক্তি। তাই আমি সংক্ষেপে উত্তরগুলো দিচ্ছিঃ

- প্রথমত, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি তারা তুলেছে তার জবাব দিচ্ছি, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

অতঃপর যখন ইব্‌রাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হলো তখন আমার (প্রেরিত ফেরেস্তাদের) সাথে লুত কওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিল। বাস্তবিক ইব্‌রাহীম ছিল বড় সহনশীল প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাবের ও কোমল হৃদয়ের। (হুদ ১১ঃ ৭৪-৭৫)

আসলে এই আয়াত দ্বারা তাদের মিথ্যা অভিযোগ কখনোই সত্য প্রমাণ করা যায় না। কারণ তাফসীরকারকগণ স্পষ্টই বলেছেন যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুশ্চিন্তা ছিল লুত (আঃ)-কে নিয়ে, তার কওমকে নিয়ে নয়। যখন ফেরেশতারা বলেছিলঃ

তারা বলল ঃ "নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করবো....." ('আনকাবুত ২৯ঃ ৩১)

ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেন, " যদি তোমরা সেখানে ৫০ জন মুসলিম পাও, তাহলেও কি ধ্বংস করবে?"

তারা বলল, "না।"

তিনি বললেন, " তাহলে ৪০ জন ?"

তারা বলল, "না।"

তিনি বললেন, " তাহলে ২০ জন ?"

তারা বলল, "না।"

তিনি বললেন, " যদি সেখানে থাকে ১০ জন বা ৫ জন ?"

তারা বলল, "না।"

তিনি বললেন, তাহলে ১ জন ?"

তারা বলল, "না।"

তিনি বললেনঃ সেখানে তো লুত আছে ! তারা বললঃ 'সেখানে কারা আছে আমরা তো তা ভালো করেই জানি । আমরা লুত ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করবোই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত..... ।[২]
এই আয়াত দিয়েই তাফসীরকারগণ ঐ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ।[৩]

কোরআনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা (তাফসীর) হলো, কোরআন দ্বারা কোরআনের তাফসীর । উপরোল্লেখিত সূরা হুদের ঐ আয়াতটি সূরা আনকাবুতে আয়াতটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হল ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

আর যখন আমার ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্‌রাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করবো, নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালিম । ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেনঃ সেখানে তো লুতও আছে । তারা বললঃ সেখানে কারা আছ, আমরা তা ভালো করেই জানি । আমরা লুতকে ও তাঁর পরিবারকে অবশ্যই রক্ষা করবো, তাঁর স্ত্রী ব্যতিত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত । ('আনকাবুত ২৯ঃ ৩১-৩২)

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মূল চিন্তাটাই ছিল লুত (আঃ)-এর ব্যাপারে । লুত (আঃ)এর জন্যই তিনি ফেরেশতাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন । এবং ফেরেশতারাও তাঁকে লুত (আঃ) এর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছিল । তারপরও যদি আমরা একথা তর্কের খাতিরেও গ্রহণ করি যে, তিনি লুত (আঃ) কওমের ব্যাপারে ফেরেশতাদের বোঝাচ্ছিলেন; তাহলে আমরা নিচের কোন্‌ ব্যাখ্যাটি নিব ঃ

তিনি ঐ কাফির ও জালিমদের পক্ষে ছিলেন এবং তাদের সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ), নাকি তিনি চাচ্ছিলেন যে, তাদের উপর আযাব আসার আগে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হোক । অবশ্যই নবীরা (আঃ) ছিলেন তাদের কওমের মধ্যে সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের । তার মানে এই নয় যে তারা কাফিরদের পক্ষে ছিলেন ।

তাদের দাওয়ার কারণে তারা সবসময় চাইতেন যেন, মানুষ হিদায়াত পায় । যেমন আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই । তাহলে যখন তার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠানো হলো । তিনি ঐ অস্বীকারকারী কওমের বিরুদ্ধে যেকোন হুকুম দিতে পারতেন । কিন্তু তিনি বললেন, " বরং আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশধরদের মধ্যে থেকে এমন মানুষ বের করবেন যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না ।" এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন ।

---

[২] 'আনকাবুত ২৯ঃ ৩২

[৩] হাদিসটি আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন তার তাফসীরে - ১৫/৪০৩ খন্ড, এবং ইবন কাসীর - ২/৫৯৪ খন্ড ।

নবী রাসূলগণ সকলের চেয়ে সম্মানিত মানুষ। তাঁদের ব্যাপারে আমাদের আদব হলো, আমরা তাদের ব্যাপারে কখনো নেতিবাচক চিন্তা করবো না। অর্থাৎ আমরা তাদের ব্যাপারে এমন কোন বুঝ নিব না যা কিতাবে বর্ণিত তাদের দাওয়াহর বিরোধী। তাদের কোন দোষ ত্রুটি খোঁজাও আমাদের উচিৎ নয়। আর যারা তাদের ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায়, তারা নিজেরাই নিজেদের ধোঁকা দেয়। কারণ, তাদের যুক্তিগুলো কোরআনের বক্তব্যের বিরোধী।

আল্লাহর নবীগণ হচ্ছেন সেই মানুষ যাদেরকে মূলত পাঠানোই হয়েছে শিরক আর কুফরের শত্রু হিসেবে। তারা কাফির ও মুশরিকদের সাথে স্পষ্ট শত্রুতা পোষণ করেন।

যখন এই বিভ্রান্তের দল কোন বক্তব্যের কোন দলীল পায় না, তখন কিতাব থেকে তারা এমন আয়াত খুঁজতে থাকে যেমনটি তাদের মন চায়। তারা সেইসব আয়াত খুঁজে যেগুলো দ্বারা জোড়াতালি দিয়ে তাদের খোড়া যুক্তিকে দাঁড় করাতে পারে। তারা কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কোরআনের সেই আয়াতকে অস্বীকার করে যেগুলো স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেমন সূরা মুমতাহিনার আয়াতটি ঃ

আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও ... (আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

লক্ষ্য করুন এই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন- **'এতে উত্তম আদর্শ রয়েছে।'** পরবর্তী আয়াতে সেই একথা তিনি আবার উল্লেখ করেছেন গুরুত্ব সহকারে,

নিশ্চয় তাঁদের (ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীগণ) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা করে তাদের জন্য ... (আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৬)

এমন স্পষ্ট আয়াত ছেড়ে তারা ছুটে যায় সূরা হুদ এর সেই আয়াতটির। সেখানেও আল্লাহ পরবর্তীতে ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

ও ইব্‌রাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও। (হুদ ১১ঃ ৭৬)

একবার চিন্তা করে দেখুন এই সব বিভ্রান্ত মানুষের কথা; শয়তান কিভাবে তাদের পথভ্রষ্ট করেছে এবং প্রশংসা করুন মহান আল্লাহর যিনি হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন ।

‘তোমাদের অন্তরের জন্য দু’টি চোখকে জাগিয়ে দাও ।
আর রহমানের ভয়ে যারা শুধুই কাঁদবে ।
কারণ তোমার রব চাইলে তুমি হতে তাদেরই মতন ।
তোমার ক্বলবের নিয়ন্ত্রণ তো আর রহমানের হাতে ।

- দ্বিতীয়ত, তারা বলেছেন ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর শরীয়াহ আমাদের পূর্বের উম্মতদের জন্য, আমাদের জন্য ইব্‌রাহীম (আঃ) এর শরীয়াত নয় । আশ্চর্য যুক্তি ! এই যদি তাদের কথা হয় তাহলে আল্লাহ তা’আলার সেই সব আয়াত সম্পর্কে তারা কি বলবেঃ

আর অবশ্যই <u>তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে</u> ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে । তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও । আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি । আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল । (আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

সবগুলো আয়াতই স্পষ্ট–

তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তাঁদের (ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের) মধ্যে । আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ । (আল-মুমতাহিনা ৬০ঃ ৬)

এখানেই শেষ নয়– আরও আছেঃ

ইব্‌রাহীমের মিল্লাত থেকে কে বিমুখ হতে পারে, সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে? (আল-বাকারা ২ঃ ১৩০)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (আন-নাহল ১৬ঃ ১২৩)

এছাড়া রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহতে নির্ভরযোগ্য অনেক হাদীস পাওয়া যায় যেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল-হানিফিয়্যাহ, আস-সামহাহ; আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মিল্লাত।

কোরআন ও সুন্নাহতে এমন অসংখ্য দলীল আছে যা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর দাওয়াহর মাঝে কুফ্‌ফারদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ও তাদের বিরোধিতা ছিল এবং শত্রুতা ছিল তাদের উপাস্য ও তাদের আইন বিধানের প্রতি। আর এটাই ছিল আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের মূল স্তম্ভ।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায়, "নবীগণ সবাই ছিলেন '*আলাত* সন্তান।" অর্থাৎ তাদের ভিক্তি ছিল এক ও অভিন্ন তবে শরীয়াহর শাখাপ্রশাখায় কিছু ভিন্নতা ছিল, এ বইতে আমরা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, তাওহীদের দাবীই হলো শিরকের সাথে সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। এক্ষেত্রে 'মানসুখ' (একটির আগমনের আরেকটি বাতিল হওয়া) হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই। কারণ এটা শরীয়াহর বিষয় নয় যে পূর্বের শরীয়াহ বাতিল হয়ে নতুন শরীয়াহ কার্যকর হয়েছে। বরং এটা সেই অপরিবর্তনীয় তাওহীদের নীতি যা সকল নবী রাসূলগণ অনুসরণ করেছেন, শিরক ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণের নীতি একটাইঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

আল্লাহর ইবাদত করবার ও ত্বগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেয়ার জন্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (আন-নাহল ১৬ঃ ৩৬)

মহিমাময় আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতিত যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদাত কর। (আল-আম্বিয়া ২১ঃ ২৫)

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেছেনঃ

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য সেই দ্বীন নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছেন, এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, আর আমি ইব্রাহীম.....(শূরা ৪২ঃ ১৩)

- তৃতীয়ত, সমালোচকদের বক্তব্যটি ছিল সূরা মুমতাহিনার আয়াতটি মদীনায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে; অর্থাৎ যখন দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) ছিল তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

এর উত্তরে আমরা বলতে চাই, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তাঁর নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন আমাদের জন্য, আমরা একটি পরিপূর্ণ দ্বীন পেয়েছি, যা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কেউ যদি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মাক্কী ও মাদানী আয়াতের মাঝে পার্থক্য করতে চায়, তাহলে তাদেরকে দলীল পেশ করতে হবে নতুবা তারা মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে। কারণ, আল্লাহ বলেছেনঃ

আপনি বলুনঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ নিয়ে এসো। (আল-বাকারা ২ঃ ১১১)

কোন ধরনের দলীল ছাড়া ইচ্ছামত এমন যুক্তি পেশ করলে, তা বাস্তবিকই, দ্বীনের মধ্যে ব্যাপক ভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়। সেই সাথে এই ধরনের যুক্তি শরীয়াহর অনেক বিষয়কে অস্বীকার করতে বলে। তবে তারা যদি একথা বলতো যে, "এ মিল্লাত পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটানো বা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া বিষয়টি, একটি মুসলিমের (একাজ করার) ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।" তাহলে আমাদের কোন বিরোধিতা থাকতো না। কিন্তু তারা তো যুক্তি দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের কাজকে অবান্তর বলেই উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর অল্প সংখ্যক অনুসারীদের নিয়ে এ ঘোষণা দেন, তখন তো তাঁর কোন রাষ্ট্র ছিল না বরং তারা সেখানে ছিল দুর্বল। তারপরও আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-কেই আমাদের উত্তম আদর্শ বলেছেন; যারা বিশ্বাস রাখি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর তাদের জন্য। আর আমরা তো এ কথা ভালো করেই জানি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) মাক্কী কি মাদানী - তার সারাটি জীবনই তিনি এই তাওহীদের দাওয়াহ দিয়ে গেছেন। তাঁর দাওয়াহর মাঝে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন শিরকের সাথে আর তারা যেগুলোর ইবাদত করতো সেগুলোর সাথেও। আর এটাই ছিল ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বাঁধন; যার ইতিহাস আমরা তাঁর সীরাতে খুঁজে পাই – আল্লাহ তাঁর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। এ বইতে আমরা এমন কিছু উদাহরণও তুলে ধরেছি। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, এই আয়াতটির সাথে ইসলামী রাষ্ট্র থাকা না থাকা সম্পর্ক রয়েছে; তাহলে ঐ সমস্ত সূরা ও আয়াত সম্পর্কে কি বলবেন যেখানে শিরকের সাথে শত্রুতাকে স্পষ্ট করা হয়েছে ?

. .

আপনি বলে দিনঃ হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর । (আল-কাফিরূন ১০৯ঃ ১-২)

... তাঁর এই বাণী পর্যন্ত ঃ

তোমাদের দ্বীন (কুফর) তোমাদের জন্য এবং আমাদের দ্বীন আমাদের জন্য । (আল-কাফিরূন ১০৯ঃ ৬)

আবু লাহাবের বিরুদ্ধে নাযিলকৃত আয়াতটিঃ

ধ্বংস হোক আবু লাহারের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও । (লাহাব ১১১ঃ ১)

এছাড়া এই আয়াতটির কথা ভাবুন । যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

. . .

.

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্‌যা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে? তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান ? এই প্রকার বন্টনতো অসংগত? এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি । তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে । (আন-নাজ্‌ম ৫৩ঃ ১৯-২৩)

সূরা আম্বিয়ার আয়াত দু'টিও কি একই কথা বলে নাঃ

.

নিশ্চয়! তোমরা (কাফিররা) এবং তোমাদের ঐ সব ইলাহ যাদের তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদত করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তোমাদের এই আলিহারা (ইলাহ- এর বহু বচন) প্রকৃত উপাস্য হতো তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। আর তারা সবাই তাতে অনন্তকাল থাকবে। (আল-আম্বিয়া ২১ঃ ৯৮-৯৯)

এসব আয়াতই মক্কায় নাযিল হয়েছে। এমন আরো অনেক রয়েছে। আমরা এই বইতে আরো উল্লেখ করতে চাই আল্লাহর সেই বক্তব্য যা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর ব্যাপারে দিয়েছেনঃ

আর যখন কাফিররা আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। তারা বলেঃ এ কি সেই লোক, যে তোমাদের দেবীদের সমালোচনা করে। (আল-আম্বিয়া ২১ঃ ৩৬)

আয়াতের শেষ অংশ লক্ষ্য করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সম্পর্কে কি বলা হয়েছে- " যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসব দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং তিনি নিজেকে এসব মুশরিক ও কাফিরদের থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এসব ঘটনা কি মদীনার ? নাকি এগুলো মক্কার আয়াত ? উদাহারণ তো রয়েছে আরো অনেক।

- চতুর্থত, তাদের কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মূর্তি ভাঙার হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, আর তারা ভেবেছেন যেন এই একটি সমালোচনাই এই মহান মিল্লাত সংক্রান্ত পুরো বইয়ের সকল বক্তব্যকে উড়িয়ে দিবে।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম জবাব হলো- এই হাদীসটি হাসান সূত্রে মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন, 'আসবাত বিন মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নাইম বিন হাকিম আল-মাদানী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবি মারিয়াম থেকে, তিনি আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন, *"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমি বের হলাম আর কাবা পর্যন্ত পৌঁছুলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'বসো'; এবং তিনি আমার কাঁধের উপর উঠলেন। অতঃপর আমি তাকে উঁচু করতে লাগলাম, কিন্তু তিনি আমার দুর্বলতা বুঝতে পারলেন। সুতরাং তিনি নামলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য বসে পড়লেন এবং বললেন, "আমার ঘাড়ের উপর উঠো"। তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, 'সুতরাং আমি তাঁর ঘাড়ের উপর উঠলাম'। তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, 'অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।'*

তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, 'আমার মনে হতে লাগল যেন আমি ইচ্ছা করলে আকাশের দিগন্তে পৌঁছাতে পারতাম যতক্ষণ না আমি সেই ঘরের (কাবা) উপর পৌঁছুলাম যেখানে তামা বা পিতলের মূর্তি ছিল। সুতরাং এটিকে এর ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে ঠেললাম, যতক্ষণ না এটি আমার আয়ত্তে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'এবার ওটাকে ফেলে দাও।' সুতরাং আমি এটাকে ফেলে দিলাম এবং এটি ভাঙা বোতলের ন্যায় চূর্ণ হয়ে গেল। এরপর আমি নামলাম এবং রাসূলুল্লাহ এবং আমি দ্রুত প্রস্থান করলাম যতক্ষণ না আমরা বাড়িগুলোর মাঝে লুকালাম, এই ভয়ে যে কওমের কেউ হয়ত আমাদের দেখে ফেলবে।"

আমার (লেখকের) বক্তব্য হলোঃ আসবাত ইবন মুহাম্মাদ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি তাকে শুধু আছ ছাওরী থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসের জন্যই দুর্বল ধরা হয়। আর এক্ষেত্রে তিনি আথ-থাওরী থেকে বর্ণনা করেননি।

আর নাইম বিন হাকিমকে *'তারিখ বাগদাদ'* গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইয়াহিয়া ইবন মাইন এবং আল-আজালি। [তারিখ বাগদাদ ১৩/৩০৩]

এবং আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ বিন হাম্বল আরো বলেন, "নাসর ইবন আলী আমার নিকট বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, নাইম বিন হাকিম থেকে, তিনি আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, *"কাবার উপর কিছু মূর্তি ছিল, সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর উপর তুলতে শুরু করলাম, কিন্তু আমি অক্ষম ছিলাম। অতএব তিনি আমাকে উঁচু করলেন এবং আমি সেগুলেতে আঘাত করতে শুরু করলাম। আর আমি যদি চাইতাম তাহলে আকাশে পৌঁছাতে পারতাম।" [আল মুসনাদ ১/১৫১]*

এবং আল-হায়ছামী তাঁর *মুজমি আল জাওয়াইদ* গ্রন্থে *"তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতৃক মূর্তি ধ্বংসকরণ"* অধ্যায়ে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, এবং এরপর তিনি বলেছেন, '... আহমাদ ও তার পুত্র, আবু ইয়ালা এবং আল-বাজ্জার কর্তৃক বর্ণিত। তিনি (আল-বাজ্জার) আলী (রাঃ) র কথার পর আরো কিছু কথা যোগ করেছেনঃ *'... সুতরাং আমরা বাড়িগুলোর মাঝে আশ্রয় নিলাম। এরপর এতে (কাবায়) আর একটিও যোগ করা হয়নি'*- অর্থাৎ আর কোন মূর্তি যোগ করা হয়নি। তিনি বলেন, *'... এবং এই সকলের (বর্ণনার) বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই বিশ্বাসযোগ্য।' [মুজমি আজ-জাওয়াইদ, খন্ড ৬/২৩]*

এবং আল–খাতিব আল-বাগদাদী বলেন, "আবু নাইম আল হাফিয আমাদের নিকট লিখিত দলীল থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর আহমাদ ইবন ইউসুফ ইবন খাল্লাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, 'মুহাম্মাদ ইবন ইউনুস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন,''আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ আল খুরাইবি আমাদের নিকট নাইম বিন হাকিম আল মাদানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমার নিকট আবু মারইয়াম, আলী ইবন আবু তালিব থেকে (রাঃ) বর্ণনা করেন, যিনি বলেনঃ *'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাথে নিয়ে মূর্তিগুলোর নিকট গেলেন।*

অতঃপর তিনি বললেন, 'বস', সুতরাং আমি কাবার পাশে বসলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘাড়ে উঠলেন এবং বললেন, 'আমাকে নিয়ে মূর্তির (নাগাল পাওয়া পর্যন্ত) উঁচু হও।' সুতরাং উঠে আমি দাঁড়ালাম কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিচে আমার দুর্বলতা টের পেলেন, তিনি বললেন, 'বস', সুতরাং আমি বসলাম এবং আমার উপর থেকে তাকে নামতে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য বসলেন এবং আমাকে বললেন, 'হে আলী, আমার ঘাড়ের উপর উঠ,' সুতরাং আমি তাঁর ঘাড়ের উপর উঠলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং যখন (সোজা হয়ে) দাঁড়ালেন তখন আমার মনে হল যেন আমি যদি চাইতাম তাহলে আকাশে পৌঁছাতে পারতাম। এবং কবার উপরে উঠলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরে দাঁড়ালেন। সুতরাং আমি তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তিটির দিকে এগুলাম; মূর্তিটি কুরাইশদের; যা ছিল তামার তৈরী এবং এটি কাবার সামনের দেয়ালের সাথে লোহার হুক দ্বারা আটকানো ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'ওটাকে পাকড়াও (মুক্ত কর)'। সুতরাং আমি ওটাকে পাঁকড়াতে থাকলাম এবং পাঁকড়ানো থামালাম না। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন, 'চালাতে থাকো, চালাতে থাকো, চালাতে থাকো।' আর একে ঠেলা বন্ধ করলাম না যতক্ষণ না একে পাকড়াও করে মুক্ত করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'একে আঘাত কর!' সুতরাং আমি আঘাত করলাম এবং এটাকে ভাঙলাম এবং এরপর আমি নেমে আসলাম।" [তারিখ বাগদাদ, খন্ড ১৩/৩০২-৩০৩]

আমার (লেখক) বক্তব্য হলোঃ আবু মারইয়াম হচ্ছেন কায়স আস-সাকাফি আল-মাদা'নী, তিনি বর্ণনা করেছেন আলী (রাঃ) থেকে, আর তার (কায়স) কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন নাইম ইবন হাকিম। ইবন হিব্বান *'আছ ছিকাক্ব'* গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করেছেন; আর আন নাসাঈ তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। বিষয়টি আল হাফিজ ইবন হাযার ব্যাখ্যা করেছেন, "এটি একটি ভুল যে (কেউ কেউ দাবী করে) আবু মারইয়াম আল-হানাফীই 'কায়স'। কিন্তু সত্য কথা হলো, যাকে কায়স বলা হয়ে থাকে তিনি আসলে আবু মারইয়াম আস-সাকাফি (আল-হানাফি নন)..." এরপর তিনি বলেন, "... তবে আমার পঠিত আন নাসাঈর *'আত তামইয'* গ্রন্থে তিনি একজনকেই উল্লেখ করেছে আবু মারইয়াম কায়স আস-সাকাফি নামে। হ্যাঁ, তিনি *'আত তামইয'-এ* তার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আবু মারইয়াম আল হানাফির কথা তিনি উল্লেক করেননি; এর কারণ হলো, তিনি শুধুমাত্র তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন যাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন।"

আর যারা এই হাদীসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তারা এই দু'জন মানুষকে (আছ ছাকাফি ও আল হানাফি) নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিৎ। এছাড়াও আল হাফিয আয যাহাবী তাকে বিশ্বত্ব মনে করতেন[৪]; আর ইবন আবি হাকিম তাকে *'আয-যারহ আত-তা'দিল'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং আল বুখারী উল্লেখ করেছেন *'আত তারিখ আল কাবীর'* গ্রন্থে কিন্তু তিনি তার ব্যাপারে কোন সমালোচনা করেননি, প্রশংসাও করেননি। সুতরাং তিনি আল-হানাফি বা আল-কুফি নন। *[মিজান আল ইতিদাল (৪/৫৭৩)]*

---

৪ আল-কাসিফ (৩/৩৭৬)

এবং এই হাদীসটিকে প্রত্যয়ন করেছেন আল্লামাহ আহমেদ শাকির; তিনি বলেছেনঃ "এই বর্ণনাসূত্র সহীহ। নাইম ইবন হাকিমকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন আল মা'ইন এবং অন্যরা; এবং আল বুখারী তার ব্যাপারে বলেছেন *'আত তারিখ আল কাবীর'* গ্রন্থে কিন্তু তিনি তার ব্যাপারে কোন সমালোচনা করেননি। আবু মারইয়াম; তিনি হলেন আস-সাকাফি আল-মাদা'নী এবং আল বুখারী তার ব্যাপারেও বলেছেন, তবে তিনি তার কোন সমালোচনা করেননি।" তিনি বলেন, "এবং যে বিষয়টি এখানে পরিষ্কার তা হলো যে, এটি হিজরতের (মদীনায়) পূর্বের ঘটনা।[৫]

আমার বক্তব্য হলোঃ আর তাছাড়া, এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর, এই গ্রন্থে আমি একথা উল্লেখ করেছি যে, "... এসব সত্ত্বেও, আমরা যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করেও নিই যে, মক্কায় যখন ইসলাম দুর্বল অবস্থায় ছিল; তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মূর্তি ভাঙার ঘটনাটি সহীহ নয়; তারপরও তিনি তখন একান্ত অনুসরণের দ্বারা এই মিল্লাতের অনুসারী ছিলেন; কঠোরভাবে তিনি এটি অনুশীলন করেছেন; কারণ তিনি কখনো এক মুহূর্তের জন্যও কাফিরদের সাথে আপোষ করেননি। আর তাদের মিথ্যা ভন্ডামী বা তাদের দেবতাদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত হননি। বরং এই তের বছর এবং এর পরবর্তী বছর সমূহেও তাঁর সকল লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিলঃ

আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগুত থেকে নিরাপদ থাক। (আন-নাহল ১৬ঃ ৩৬)

'সুতরাং তিনি তের বছর তাদের মধ্যে অবস্থান করেছেন এর মানে এই নয় যে, তিনি তাদের গুণগান করেছেন বা প্রশংসা করেছেন, অথবা তাদের সম্মান করার মত কোন চুক্তি করেছেন..." আমি এও বলেছি, "... তিনি বরং প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে তাঁর শত্রুতা এবং বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিতেন; আর তাঁর নিজ ও তার সাহাবাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও তাদের দেবতাদের প্রতি কুফর ঘোষণা করতেন। আমরা ইতিমধ্যেই আপনাদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। আর আপনি যদি মাক্কী যুগে নাযিলকৃত সূরাগুলো পড়েন তাহলে বিষয়টির অধিকাংশই আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে...।"

সুতরাং তেমন নয় - যেমনটি তারা (সমালোচকগণ) ভেবেছেন যে - শুধুমাত্র একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করেই পুরো আলোচনাকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করবেন। বরং এ বিষয়ের পক্ষে ইসলামী শরীয়াতে বড় বড় সাক্ষী (দলীল); স্পষ্ট প্রমাণ; সুনিশ্চিত নীতি (ফিকহ) এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান রয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে কেউই অস্বীকার করবে না একমাত্র সে ছাড়া যে অহংকার করে কোন কিছু অস্বীকার করে।

আর সত্য তো এক শক্ত পিলার,
ভাঙবে তাকে সাধ্যটা কার?
যদিও তুমি একসাথে নাও,
সমস্ত কিছু জগৎটার।

[৫] আহমেদ শাকির কর্তৃক লিখিত আল মুসনাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (২/৫৮)

আর এই আলোচনাতেই আশা করি যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাদের জন্য যারা হিদায়াত পেতে চায়।

এই ভূমিকা সমাপ্ত করার আগে আমি আরো একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই, কারণ জেলে থাকাকালীন কিছু সুপরিচিত ইরজায়ী[৬] দলের ব্যক্তিদের সাথে আমার ঈমান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়েছে।

এদের মধ্যে একজন ছিল যে ছিল এদের নেতাদেরও নেতা; আর সে শিরক ও মানব রচিত আইনের সৈনিকদের রক্ষা করার জন্য দলীল দিতঃ হাতিব ইবন আবি বালতায়া (রাঃ) এবং আবু লুবাবাহ আল-আনসারী (রাঃ) এর ঘটনা থেকে। সে দাবী করত যে হাতিব কাফিরদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিল এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ছিল এবং আবু লুবাবাহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কাফির ঘোষণা করেননি[৭]। আর এখান থেকেই সে কিয়াস করে বুঝতে পারে যে, এইসব শিরক ও মানব রচিত আইনের জন্য যুদ্ধরত সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শরীয়াত বিরোধী; আর এইসব মানুষের প্রতি তাদের শত্রুতাও ঐ দুই সাহাবার আমলের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। তাদের মতে ত্বগুতের এইসব সহচর ও সৈনিক যারা শিরক ও মানব রচিত আইন রক্ষার জন্য ও ত্বগুতের সিংহাসন রক্ষার জন্য তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে এবং শারীয়াহ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; তাদেরকে কাফির ঘোষণা করা যাবে না কারণ, তাদের অপরাধ হাতিব বা আবু লুবাবাহর কাজের সমান নয়! সে এসব ধৃষ্টতার সীমা চরমভাবে অতিক্রম করে যখন আমরা তাকে জানালাম যে তারা শিরক ও মানব রচিত আইনের সৈনিকদের তাকফির করে না, তাদেরকে শুধুমাত্র অন্যায়কারী দুষ্টলোক মনে করে। আর এতেই সে ক্রোধে ফেটে পড়ে, কারণ তার মতে আমরা তার কথাকে বিকৃত করেছি; আসলে সে ঢালাওভাবে এইসব মানুষকে অন্যায়কারী বা দুষ্টলোক বলেনি। তিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তাদেরকে তাকফির করার বিপক্ষে তার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য, তার মতে প্রকৃতপক্ষে, 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত অন্যায়কারী বা দুষ্ট প্রকৃতির।'[৮] সে বলতে চাচ্ছিল যে, তাদের কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত আমলের ভিত্তিতে অন্যায়কারী (ফাসেক) হতে পারে, কিন্তু ত্বগুতকে সহায়তা করা বা শরীয়াত ও এর অনুসারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এসব কোন কারণে তারা মোটেই দোষী নয়।

---

[৬] ইরজাঈ দল বলতে মুরজিয়াদের কথা বলা হয়েছে। তারা মনে করে মানুষ তার কাজের দ্বারা কাফির হয় না। তারা কখনোই তাদেরকে তাকফির করে না যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে তাদের আইন প্রতিষ্ঠা করে বা আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এ ব্যাপারে শেখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী '*মুরজিয়াত আল-আসর*' নামে একটি বই লিখেছেন।

[৭] আমি তাদের জেলে থাকা অবস্থায় একটি বই লিখেছি; বইটির নাম ঃ"*আশ শিহাব আস-সাকিব ফি আর-রাদ আলা মান ইফতারা আলা আস-সাহাবী হাতিব*"।

[৮] অর্থাৎ সাধারণভাবে ঐ ব্যক্তি এসমস্ত ত্বগুতের সৈনিক, যারা শরীয়াত ও তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের অন্যায়কারী বা দুষ্টলোক বলতেও নারাজ।

সুতরাং আমি তাদেরকে বললাম, "এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, শিরক ও ত্বগুতের সৈনিক যারা আল্লাহর সমকক্ষ করছে, তাদেরকে অন্যায়কারী বা ফাসেক বলাকে তোমরা অন্যায় মনে করছ, অথচ হাতিবের (রাঃ) ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য নির্দ্বিধায় বলে যাচ্ছো যেঃ 'সে কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়ে ছিলেন এবং তাদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন'; আবার আবু লুবাবাহ (রাঃ) সম্পর্কে তোমরা বলছঃ 'তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।'" [তারা সাহাবাদের ব্যাপারে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করছে অথচ তাগুতের সৈনিকদেরকে ফাসেক বললেও তারা রাগে ফেটে পড়ছে]। আর এখানেই তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

আর যখন জেলের ভিতর ইসলামপন্থীরা আমাদের সাথে তাদেরকে মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালায় , তখন এসব ইসলামপন্থীদের সাথে আমাদের কিছু বৈঠক হয়। তখন আমরা দেখলাম যে, এরাও ঐ তাদের মত একই ধারণা পোষণ করে [হাতিব ও আবু লুবাবাহ (রাঃ) এবং অন্যান্য ব্যাপারে]। সুতরাং আমি তাদেরকে বললাম, "সোজা কথা তোমাদের সাহচর্যের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদেরকে ধোঁকাবাজ মুনাফিক বললে তোমরা সেটাকে অন্যায় মনে কর না; অথচ আল্লাহর শত্রু ও ত্বগুতের সৈনিকদের শুধুমাত্র 'অন্যায়কারী' বললেই তোমাদের কাছে তা অপরাধ মনে হয়। আর একারণেই, আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাদের সাহচর্যে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। বরং তোমাদের পাত্তা দেই না আর তোমাদের নিয়ে আমরা নিজেদের ব্যস্ত রাখতে চাই না, কারণ আমরা এখন জেলে রয়েছি; আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের মাঝখানে।"[৯] একথা বলার সাথে সাথে তাদের নেতা রেগে গেল এবং তার অন্তরের লুকানো সত্য প্রকাশ করে দিয়ে বলল, "প্রকৃতপক্ষে তোমরা মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের দিকে আহবানকারী একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু না। আর যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের দিকে ডাকে সে রাজনৈতিক কারণে বিভ্রান্ত। তারা যেটার দিকে ডাকে তা আসলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টিকারী- যারা (ইহুদী-খ্রীষ্টান) ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বংশধর।" আর একারণেই এই ঘটনাটি একখানে উল্লেখ করলাম যাতে এ স্থানে একটি (মিল্লাতে ইব্‌রাহীম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার) প্রমাণ থাকে।

আর এই বক্তব্যের আমি কি জবাব দেব তা আমার জানা নেই।

আর আমি এসব মানুষের জবাব কিভাবে দিব যারা খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে চায় অথচ তারা স্পষ্ট দু'টি জিনিসের পার্থক্য করতে জানে না। "ইব্‌রাহীমের বংশধরগণ"- এই কথাটিই ইদানিং ত্বওয়াঘিত (ত্বগুতের বহুবচন) ব্যবহার করছে ইহুদীদের ঠান্ডা করে তাদের সাথে শান্তি আলোচনায় বসার জন্য; আর এটির উদ্দেশ্য হলো ঈমানের বন্ধনসমুহ ছিন্ন করা এবং দ্বীনের ভিত্তিকে নষ্ট করা আর 'আল ওয়ালা বারা'আ' এর ভীত নষ্ট করা। এবং আল্লাহ আ'আলা তাদের জবাব দিয়েছেন; তিনি বলেনঃ

---

[৯] কারণ তারা সবসময়ই আল্লাহর শত্রুদের মন যুগিয়ে চলত। এছাড়াও তারা ওদের পিছনে সালাত আদায় করত। যখন আমরা আলাদাভাবে জুম্মা পড়তাম এবং অন্য কয়েদীরাও আমাদের সাথে যোগ দিত তখনও তারা ত্বগুতের সৈনিকদের পিছে সালাত আদায় করত, অথচ তাদেরকে এজন্য কেউ বাধ্য করেনি। তাদেরকে দেখলে তারা এগিয়ে গিয়ে আনন্দের সাথে সালাম দিত, ঈদের দিন চুমু খেত। আমি তাদের কয়েকজনকে দেখেছি যারা ইসলামের দাওয়া দেয় অথচ ত্বগুতি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

ইব্‌রাহীম ইহুদীও ছিল না, খ্রীষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না। (আলি-'ইমরান ৩ঃ ৬৭)

সুতরাং তারা এই কথার সাথে 'মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের' পার্থক্য করে না; যার কারণে পিতা ও সন্তানের মাঝে সম্পর্কোচ্ছেদ হয়; কারণ এটিও হলো আর রহমানের বন্ধুদের সাথে আশ শায়তানের বন্ধুদের মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেনঃ

যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইব্‌রাহীমের মিল্লাত থেকে আর কে বিমুখ হবে।
(আল-বাকারা ২ঃ ১৩০)

আর এই বইতে আমরা আপনাদের জন্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি; সুতরাং বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবেন এবং এর বিরোধিতাকারীদের বিভ্রান্তিতে কান দিবেন না।

হে আমার মুওয়াহিদ ভাই, আসলে এটা খুবই আফসোসের বিষয় যে, বইটি প্রকাশের পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, আমার বিরোধীরা, আমার সাথে বিতর্ককারীরা বা যারা আমাদের ও আমাদের দাওয়াহ্‌র প্রতি অভিযোগের পর অভিযোগ উত্থাপন করতেন তারা অন্য কিছুই পাঠাননি শুধুমাত্র এই কয়েকটি হাস্যকর প্রশ্ন ছাড়া। আর এসব যুক্তিতর্ক এতই নিকৃষ্ট পর্যায়ের যে এর উত্তর দেয়াটাও আমাদের জন্য অসম্মানজনক। এবং আমরা এসবের উত্তর দিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করতাম না, যদি না আমরা জানতাম যে, আজ আমাদের উম্মাহ মিল্লাতে ইব্‌রাহীম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং তাদের অনেকেই এসব মূর্খ এবং ভ্রান্ত আকীদার মানুষদের কথাকে গুরুত্ব দেয়, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আলি-'ইমরানের শুরুতে বলেছেন[১০]।

১০

তিনিই তোমার প্রতি নাযিল করেছেন এই কিতাব যার কতক আয়াত মুহকাম (স্পষ্ট), এগুলোই কিতাবের মূল; আর কতক আয়াত মুতাশাবিহ (রূপক); যাদের অন্তরে সত্য লংঘনের প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে,'আমরা এটি বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (আলি 'ইমরান ৩ঃ ৭)

সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে এই দ্বীনের বিষয়ের জন্য এবং এর শত্রুদের পরাভূত করার জন্য দোআ করি ।

আরো দোআ করি যেন তিনি আমাদেরকে এই মিল্লাতের পক্ষে কায়েম রাখুন যতদিন আমরা জীবিত থাকি; আমাদেরকে এই মিল্লাতের সৈনিক বানান এবং তাঁরই পথে আমাদের শহীদের মৃত্যু দান করেন । নিশ্চয় তিনিই আল কারীম । আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর সকল সাহাবার উপর ।

আবু মুহাম্মাদ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনিই আমার জন্য যথেষ্ট ও উত্তম অভিভাবক।

অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের বর্ণনা সম্পর্কিত

মিল্লাতে ইব্‌রাহীম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আত্মভোলা বোকা লোক ব্যতিত মিল্লাতে ইব্‌রাহীম হতে আর কে বিমুখ হয়?
(আল-বাকারা ২ঃ ১৩০)

নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

অতঃপর আমি আপনার কাছে একনিষ্ঠ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করার প্রত্যাদেশ করেছি। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (আন-নাহল ১৬ঃ ১২৩)

এ ধরনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা মহান আল্লাহ আমাদের পথ ও পাথেয়'র কথা বর্ণনা করেছেন। অতএব সঠিক পথ ও যথার্থ পদ্ধতি হচ্ছে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম। যার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও সন্দেহ নেই। তাই যে ব্যক্তি দাওয়াতের সংশোধন ও তার অনুসরণে এ সঠিক পথ থেকে বিমুখ হবে সে ব্যক্তি মুসলিম সমাজের উপর ফিতনা ও বিপদাপদ নিয়ে আসবে। অথবা দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের অন্তরে শয়তান যে সকল কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে সেগুলোকে সে বয়ে নিয়ে আসবে। আর এ ব্যক্তিই হচ্ছে বোকা' যে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতী পদ্ধতি হতে আরো ভাল দাওয়াতী পদ্ধতি সম্পর্কে সে অধিক অবগত মনে করে প্রতারণায় নিমজ্জিত।

অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আমি ইতোপূর্বে ইব্‌রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছি ... (আম্বিয়া ২১ঃ ৫১)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন ঃ

আমি ইব্‌রাহীমকে পৃথিবীতে মনোনিত করেছি আবার তিনি আখিরাতেও সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (আল-বাকারা ২ঃ ১৩০)

তিনি ইব্‌রাহীমের দাওয়াত পদ্ধতিকে আমাদের জন্য উত্তম বলেছেন এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-কে তাঁর দাওয়াত পদ্ধতির অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তাঁর পথ ও পদ্ধতি হতে বিমুখ তাদেরকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর মিল্লাতে ইব্‌রাহীম হচ্ছে ঃ

- এক আল্লাহর জন্যই উপাসনাকে একনিষ্ঠ করা। প্রত্যেক ঐ সকল বিষয় তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হতে হবে, যাকে অর্থবোধকভাবে একবাক্যে ইবাদত তথা উপাসনা বলা যায়।[১১]
- শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

ইমাম শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) বলেন, দ্বীন ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে দুটো ঃ

---

[১১] আল্লাহর প্রকৃত ইবাদত করা ব্যতিত বান্দা কখনো শিরক ও মুশরিকদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না। তাদের হতে মুক্ত হওয়ার শক্তি এবং তাদের বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাহস হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে মাক্কী জিন্দেগীতে কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ পড়তে বলেছেন এবং তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এটা হচ্ছে এমন পাথেয় যা তাকে কঠিন দাওয়াতী কাজের কষ্ট সহ্য করতে সাহায্য করবে। এটা তাকে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে বলা হয়েছিলঃ

"নিশ্চয় আমি আপনার উপকারী বাণী অবতীর্ণ করি।" (মুয্‌যামিল ৭৩ঃ ৫)

তিনি আরো বলেছেনঃ

. . .

"হে কম্বলওয়ালা! রাতের কিছু অংশ সালাত পড়ুন। অর্ধেক রাত অথবা অর্ধেক থেকে কিছু কম। অথবা তার চেয়ে বেশি এবং সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন।" (মুয্‌যাম্মিল ৭৩ঃ ১-৪)

সে জন্যই রাসূল (সঃ) রাতে সালাত পড়তেন। তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীগণও সালাত পড়তেন এমনকি তাদের পা ফুলে যেত। অন্য আয়াতে এ বিধানের হালকা বা শিথিলতা আসার পূর্ব পর্যন্ত।

এবং তাদের এ সালাতের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত ও আল্লাহর বাণী অনুধাবন করা। উত্তম পথের ও দা'য়ীর সামর্থ্য অর্জন করা। সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও দাওয়াতের কঠিন দুর্গমতা চিহ্নিত করা। যারা ধারণা করে, আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত দীর্ঘক্ষণ তার যিকির ও তাসবীহ ব্যতিত কেবল কঠোর পরিশ্রম দ্বারাই দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব। তাহলে তারা ভুল করছে ও গোমরাহীর মধ্যে আছে। তাই তারা যত পদক্ষেপই নিক না কেন তা সফল হবে না। তারা সঠিক, সরল ও বিশুদ্ধ পথের সাথে পাথেয় ছাড়া সংযোগ স্থাপন করতে আদৌ সক্ষম হবে না। কেননা উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়ার পাথেয়।

আল্লাহ এ সব প্রার্থনাকারীদের গুণ বর্ণনা করেছেন এবং যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ধৈর্য ধরার আহবান করা হয়েছে। কেননা তারা তাদের রবকে সকাল সন্ধ্যা ডাকে এবং তার নৈকট্য কামনা করে। আর রাতে কমই ঘুমায়। তাদের পার্শ্ব অঙ্গ বিছানা হতে দূরে থাকে, এবং তারা ভয় ভীতি ও আকাঙ্খার সহিত তাদের রবকে ডাকে আর সেই ভীষণ দিনকে ভয় করে। আরো এ ধরনের অনেক গুণেই আল্লাহ তাদেরকে আক্ষায়িত করেছেন। তবে একনিষ্ঠ ইবাদত গুজার ব্যতিত তা করা সম্ভবপর নয়। আল্লাহ আমাদের ও তোমাকে সেই গুণীজনদের অন্তর্ভুক্ত করুন - তাই এখনই সজাগ হোন!!

প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে আদেশ করা। যার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা ও ধারাবাহীকভাবে তা পালন করে যাওয়া আর যে তা বর্জন করবে তাকে কাফির বলে ঘোষণা করা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ইবাদতে শিরক করার ভয়াবহতা বর্ণনা করা এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। পরিত্যাগ করা। আর যে করবে তাকে কঠোর মনে করা।

এটাই হচ্ছে তাওহীদ যার দিকে আহ্বান করেছিল সমগ্র রাসূলগণ (আঃ)। আর এটাই হচ্ছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ। ইখলাস, তাওহীদ ও ইবাদতে আল্লাহকে একক মানা। আল্লাহর দ্বীনকে ও তাঁর ওয়ালীদের (অনুসারীদের) সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। অস্বীকার করা। আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যর সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা।

অতএব সেটি হচ্ছে বিশ্বাস ও কর্মে তাওহীদ, যা একই সাথে থাকবে আর সূরা ইখলাস তাওহীদ আল-ইতেকাদীর (বিশ্বাস) ও সূরা কাফিরূন তাওহীদ আল-আমালীর (কর্ম) দলীল। তাই নবী (সঃ) অধিক গুরুত্বের কারণে সূরা দুটি বেশী বেশি করে তিলাওয়াত করতেন এবং নিয়মিত ফজরের সুন্নাতে এবং অন্যান্য সলাতে পাঠ করতেন ।

একটি সতর্কীকরণ যা থেকে অবশ্যই উল্লেখযোগ্যঃ

কোন কোন ধারণাকারী ধারণা করে থাকে যে, আমাদের বর্তমান যুগে তাওহীদের পাঠদান, তার প্রকার জানা এবং তার তিন প্রকারকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে শেখাই যথেষ্ট। বাতিল পন্থীদের ব্যাপারে নিরবতা পালন করা এবং তাদের বাতিল আকীদা সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা না দিলেও চলবে।

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আমরা বলবো, মিল্লাতে ইব্‌রাহীম যদি এমনই হতো তাহলে তাঁর জাতি তাকে আগুনে ফেলল কেন? বরং তিনি যদি তাদের সাথে নরম নরম কথা বলতেন, তাদের কতক ভ্রান্তির (বাতিলের) ব্যাপারে নিরবতা পালন করতেন এবং তাদের উপাস্য (মূর্তির) অসারতা বর্ণনা না করতেন এবং তাদের সাথে শত্রুতার ঘোষণা না দিতেন, তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে শুধু তাওহীদের শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট মনে করতেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করতেন যেমন কারো সাথে সম্পর্ক রাখা, কারো সাথে ছিন্ন করা, ভালবাসা বা ঘৃণা করা, শত্রুতা, আল্লাহর জন্য হিজরত ইত্যাদি। তাহলে তাঁর যুগের লোকেরা তাঁর জন্য সকল সম্মান ও প্রাচুর্যের দরজা খুলে দিত এমন কি তারা এ ধরনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্‌রাসাও বানিয়ে দিত যেমনভাবে আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাহ্যিক তাওহীদ পাঠ করানো হচ্ছে এবং সে প্রতিষ্ঠানে বিরাট বড় নাম ফলক তৈরী করে নাম রাখত তাওহীদের মাদ্‌রাসা অথবা প্রতিষ্ঠান এবং দাওয়াত ও দ্বীনের মূলনীতি অনুষদ। এ ধরনের অনেক কিছুই করত। আর এ ধরনের কাজ তাদের বাতিল দ্বীনের কোন ক্ষতিই করত না। যতক্ষণ তা প্রকৃতভাবে বাস্তবায়ন ও উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা না যাবে ততক্ষণ কোন প্রভাব পড়বে না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা ও কলেজগুলো হাজার হাজার থিসিস (গবেষণামূলক প্রবন্ধ), মাস্টার্স ও ডক্টরেটকারীগণ অসংখ্য পুস্তক ইখলাস, তাওহীদ প্রভৃতি বিষয়ে লিখে যাবেন তবুও বাতিলপন্থীদের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় না

কিংবা তারা এর বিরোধিতাও করে না বরং তারা আরো উৎসাহ দেয় এবং তাদেরকে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করে এবং বিরাট বিরাট উপাধি দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাতিল বিশ্বাস ও অবস্থান সম্পর্কে বক্তব্য না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ ধরনের অবস্থা বজায় রাখে।

- শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান 'আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেনঃ এরকম কেউ হতে পারে না যে তাওহীদ বুঝে এবং সে অনুযায়ী আমল করে অথচ মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করে না। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা করবে না তাকে বলা যাবে না যে সে তাওহীদ বুঝেছে বা আমল করেছে। (জিহাদ খন্ড, পৃষ্টা-১৬৭)

তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যদি তাঁর দাওয়াতী কাজের শুরুতেই কুরাইশদের বিচক্ষণতাকে বোকামি ও তাদের মূর্তি থেকে মুখ ঘুরিয়ে না নিতেন ও এসবের দোষত্রুটি বর্ণনা না করতেন এবং যদি এসব করা হতে দূরে থাকতেন তাহলে তিনি কাফেরদের প্রভু (মূর্তির অসারতা) সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াতগুলি গোপন করতেন। যেমন আল্লাহ প্রদত্ত লাত, উজ্জা, মানাতে সালেসার অসারতা ঘোষণার আয়াত এবং যে সকল আয়াতে আবূ লাহাব ও ওয়ালীদের দোষ ও পরিণতি বলা হয়েছে সে সকল আয়াত। তেমনিভাবে তাদের দ্বীন ও প্রভুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণের আয়াত। আর যদি তিনি কতগুলি সূরা বেশী বেশী না পড়তেন যেমন সূরা কাফিরূন ও অন্যান্য সূরাগুলো, তিনি যদি ঐ কাজ করতেন (আল্লাহ এ করা থেকে তাকে দূরে রেখেছেন) তাহলে তারা তাঁর সাথে উঠা বসা করত, সম্মান করত, নিকটে রাখত, তাহলে তাঁর উপর সিজাদারত অবস্থায় উটের নাড়ীভুড়ি চাপিয়ে দিত না। তিনি তাদের পক্ষ থেকে সীমাহীন কষ্ট পেতেন যা ইতিহাস বর্ণিত আছে। হিজরত করার প্রয়োজন হত না, কষ্ট ও দুঃখ করতে হত না এবং তিনি ও তাঁর সাথীরা কাফেরদের ঘরে ও দেশে একত্রে উঠাবসা করতে পারতেন নিরাপদে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক রাখা ও বাতিল ও বাতিল পন্থীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা দাওয়াতের সূচনায় মুসলমানদের উপর ফরজ হয়; সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ্ব প্রভৃতি ফরজ হওয়ার পূর্বে। এজন্যই অন্য কোন কারণে নয় বরং এ কারণেই তারা অনেক কষ্ট ও পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন।

- শাঈখ হামদ বিন আতীক 'দুরারে সানিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেনঃ বিবেকবান ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করুন, রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে পবিত্র মক্কা নগরী হতে বের করে দেওয়ার কষ্ট সহ্য করা থেকে নিজের জন্য কল্যাণকামী ব্যক্তি গবেষণা ও অনুসন্ধান করা যে তা কত বড় কষ্টের ব্যাপার ছিল। একথা সর্বজন জ্ঞাত যে, তাদের মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে একমাত্র তাদের দ্বীনের কারণে। তারা তাদের এ দাওয়াত বন্ধ করতে চেয়েছিল, তাঁকে ও সাহাবীগণকে বহিষ্কারের হুমকি দেওয়া হয়েছিল তথাপিও তাঁরা দাওয়াত দেওয়া হতে বিরত হননি। বরং সাহাবীগণ মুশরিকদের নিষ্ঠুর শাস্তি হতে মুক্তির আবেদন পর্যন্ত রাসূল (সঃ)-কে করেছেন। তিনি তাদেরকে ধৈর্য্য ধরতে বলেছেন এবং পূর্বের যে সকল মু'মিন কষ্ট সহ্য করেছেন তাদের কথা বলে শান্তনা দিয়েছেন। কিন্তু একথা বলেননি যে, তোমরা মুশরিকদের দ্বীনের ত্রুটি বর্ণনা করা এবং তাদের জ্ঞানকে বোকামী বলা পরিত্যাগ কর। মক্কা তাদের জন্য বিশ্বের সর্বোত্তম জায়গা

হওয়া সত্ত্বেও তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কা থেকে বেরিয়ে আসা ও দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকেই বেছে নেনঃ **নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূল (সঃ) এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কিয়ামতে মুক্তি পেতে চায় এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।** [আল-আহযাব ৩৩ঃ ২১] (জিহাদ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৯)

আর এমনিভাবে আল্লাহদ্রোহী শক্তি প্রত্যেক সময় ও স্থানেই ইসলামের প্রতি তাদের সন্তোষ প্রকাশ করেনি। অথবা সন্ধি চুক্তি করবে এবং সে জন্য মিটিং করবে এবং তা গ্রন্থে ও সাময়িকীতে প্রকাশ করবে। সেজন্য তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবে, উদ্দেশ্য একটাই দ্বীন ইসলামকে কানা পঙ্গু ও ডানাকাটা রূপে প্রকাশ করা। মুসলমানদের মধ্যে হতে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা, তাদের দ্বীনের ও প্রভুদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও তাদের বাতিল নীতির বিরোধিতা করার মন মানসিকতা নষ্ট করাই হচ্ছে ঐগুলি করার মূল কারণ।

আর আমরা এগুলি সৌদী আরব নামক রাষ্ট্রে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, দেশটি মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে তাওহীদ ও তাওহীদের বইয়ের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়ে এবং তার অনুদান দিয়ে বরং আলেমগণকে কবরের সুফীবাদের তাবীজ তাগা, গাছের ও পাথরের শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুপ্রেরণা দ্বারাও ধোঁকা দিচ্ছে। এমনি আরো সব বিষয়বস্তুর প্রতি সৌদী সরকার অনুদান দেয় যা তাদের ভয়ের কারণ হয় না এবং কোন ক্ষতি করে না। অথবা যে নীতি তাদের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিশ্ব রাজনীতিতে কোন প্রভাব ফেলে না।

সেসব ক্ষেত্রেই তার দাওয়াতী কাজ সীমাবদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত বিভক্ত ও অপূর্ণাঙ্গ তাওহীদ এ ধরনের বাদশাহ ও কাফেরদের শক্তির আওতা মুক্ত না হবে ততদিন কাফেরদের পক্ষ থেকে ইহা প্রচার ও প্রসারে পৃষ্টপোষকতা, সমর্থন ও অনুপ্রেরণা পাওয়া যাবে। যদি ব্যাপারটি এমন না হতো তাহলে জুহাইমান ও তাঁর মত লেখকদের লেখনি কোথায়, যাদের লেখাগুলো তাওহীদ বিষয়ক আলোচনায় ভরপুর? কেন সেগুলোকে সরকার পৃষ্টপোষকতা করে না আর তা ছাপাতে কেন অনুপ্রেরণা ও সহায়তা করে না?

লেখনিগুলিতে এমন কিছু আছে যা তাকে কাফের বলে। সেজন্য বাধ্য করা হয়েছে প্রকাশ না করতে। নাকি তাতে এমন তাওহীদ আছে যা আল্লাহদ্রোহী শক্তি ও তাদের সমর্থকদের বিরোধিতা করে এবং রাজনীতি নিয়ে আলোকপাত করে এবং নিবেদন করে মুমিনের সাথে সম্পর্ক রাখা ও কাফেরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে। (পৃষ্ঠা- ১০৪ থেকে ১১০ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। যা আমি এ অবস্থায় তাতে পেয়েছি।)

শাঈখ হামদ বিন আতিক তাঁর '*সাবিল আন-নাজাত ওয়াল ফিকাক*' পুস্তিকায় বলেনঃ অনেক মানুষই মনে করে যখন কেউ দুটি শাহাদাত উচ্চারণ করতে পারবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়তে পারবে এবং মসজিদ বিমুখী হবে না তাহলেই তার দ্বীন প্রকাশ পাবে। যদিও সে মুশরিকদের মাঝে ব্যবসা করে অথবা দ্বীনত্যাগীদের স্থানে থাকে। তাহলে তারা দারুণ ভুল করবে।

জেনে রাখুন, কুফরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে কুফরীকারীদের সংখ্যানুযায়ী। প্রত্যেক কাফের গোষ্ঠীরই কুফরীর একটি ধরন প্রকাশ পেয়েছে আর ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান তার দ্বীন প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না সে প্রত্যেক কাফের সম্প্রদায়ের কুফরীর বিরোধিতা করবে যা তার নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে শত্রুতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

তিনি 'দুরারে সিনিয়্যাহ'তে আরও বলেনঃ দ্বীনের প্রকাশ হলো ঃ তাদের দ্বীনকে অস্বীকার করা, তাদের দ্বীনের দোষ বর্ণনা করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাহায্য ও তাদের প্রতি নির্ভরশীলতা হতে নিজেকে রক্ষা করা ও তাদের থেকে আলাদা হওয়া। শুধু সালাত পড়াই দ্বীন প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। (জিহাদ খণ্ড - ১৯৬ পৃষ্ঠা)

এবং শাঈখ সোলাইমান বিন সাহমান, (তাঁর এক কবিতায়) বলেন ঃ[১২]

এ দ্বীনের বহি প্রকাশ হয় তাদের সাথে স্পষ্ট
কুফরী দ্বারা যদি তারা কাফির সম্প্রদায় হয়।
এ শত্রুতা প্রকাশ পাবে এবং ঘৃণা স্পষ্ট হবে।
হে জ্ঞানীগণ! আপনাদের কি কোন চিন্তা নেই?
তাকে ঘৃণা করা, না ভালবাসা তা বুঝার জন্য অন্তর যথেষ্ট নয়।
আবার তার মানদণ্ড অন্তর নয়।
বরং মানদণ্ড হচ্ছে তুমি প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে
তাকে ভালবাস না, ঘৃণা কর তা জানিয়ে দেয়া।

তা ছাড়া শাঈখ ইসহাক বিন আব্দুর রহমান জিহাদ খন্ডের পৃষ্ঠা ১৪১-তে বলেন ঃ আল্লাহ যার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন তার দাবী ও ধারণা দ্বীনের প্রকাশ হচ্ছে, যে বাতিল আকীদা পড়ে অথবা যে বাতিলের ইবাদত করে তাকে নিষেধ না করার নাম। তার এ ধারণা যুক্তি ও শরয়ী উভয় দিক দিয়ে পরিতেজ্য। যে ব্যক্তি খ্রীস্টান, অগ্নীপূজক ও হিন্দু দেশে অবস্থান করবে তার জন্য এটা বাতিল বিধান। কেননা সালাত, আযান ও পাঠ্য বিষয় তাদের দেশেও বিদ্যমান আছে।

আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, যিনি বলেছেন ঃ

"যারা মনে করে - লাব্বাইকা বলা, সালাত আদায় করা, অন্যায় হতে চুপ থাকা, নিরাপদ ও দ্বীনদারী লোক হ্রাস পেয়েছে। আর দ্বীন আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব করা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রত্যেক পাপ ও বিপথ হতে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই না।"

[১২] দিওয়ান 'উকুদ আল-যাওয়াহির আল-মুনদাদাহ আল-হিসান (৭৬ - ৭৭ পৃষ্ঠায়)।

- আর আবুল ওয়াকা বিন আকীল (রহঃ) বলেছেন, "তুমি যদি বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে মাসজিদের গেটে তাদের ভীড়ের দিকে তাকিও না এবং তাদের লাবক্ষাইকা শোরগোলের দিকেও তাকিও না। বরং শরীয়তের শত্রুদের সাথে তাদের আচরণের দিকে তাকাও। আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে দ্বীনের কেল্লায় এবং আল্লাহর শক্ত রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। আল্লাহর ওলী মু'মিনদের সাথে জোট বাধতে হবে এবং এর বিরোধী শত্রুদের থেকে নির্ভয় হতে হবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার উত্তম পথ হচ্ছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার সাথে শত্রুতা ভাব রাখা এবং হাত, জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা যথাসাধ্য জিহাদ করা। (দুরারে সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় সতর্কীকরণ ঃ

মুশরিক ও শিরকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিপরীতে এখানে তৎপর হতে হবে (আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর ওলীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, সাহায্য করা, উপদেশ দেওয়া, কল্যাণ কামনা করা, এগুলো প্রকাশ করা) যাতে করে অন্তরগুলোর মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, দল মজবুত হয়। এটা হতে পারে কখনো কখনো আমাদের বিপথগামী মুওয়াহহিদ (আস্তিক) ভাইদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য বলপ্রয়োগ। আবার কখনো কঠোর উপদেশ এবং নবীদের পথ ব্যতিত তারা অন্য যে পথে চলে তার সমালোচনা করে।

শাঈখুল ইসলাম (ইবন তাইমিয়্যাহ) বলেন, একজন মুসলিম অপর মুসলমানের নিকট এমন যেমনটি দুটি হাতের যার একটি অপরটিকে ধুয়ে দেয়। কখনো এক হাত অপর হাতের ময়লা পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। আবার কখনো আরও কঠিন কাজ করা যার ফলাফলকে প্রশংসা করা হয়। এর পিছনে উদ্দেশ্য হলো, হাত দুটির নিরাপত্তা, সুস্থতা ও সার্বিক পরিচ্ছন্নতা। তাদের থেকে কোন অবস্থায় দায়মুক্তি হওয়াকে আমরা বৈধ মনে করি না। কেননা এক মুসলিমের তার অপর মুসলিম ভাইয়ের বন্ধুত্বের যে অধিকার আছে তা দ্বীনত্যাগ ও ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ অধিকারকে বেশ বড় চোখে দেখেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

যদি তোমরা তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।
(আল-আনফাল ৮ঃ ৭৩)

বিপথগামী মুসলিমের সাথে দায়মুক্ত হওয়া যায় না শুধু তার বাতিল, বিদ'আত ও বিপথগামিতা হতে দূরে থাক অথবা তার সাথে মৌলিক বন্ধুত্ব বজায় রাখে। আপনি দেখেন না বিদ্রোহী ও তদ্রূপ অপরাধিদের হত্যা করার বিধান কেমন। কেমন দ্বীনত্যাগীদের হত্যা করার বিধান আমরা এর বিপরীত কিছু করে কখনো আল্লাদ্রোহী শক্তির চক্ষু শীতল করব না। যা অনেক মুসলমান নামধারীরা করে থাকে। যাদের হাক্ব এর পাল্লা বর্তমানে নষ্ট ও ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে তারা। বরং

তারা তাদের পরিবর্তে তাওহীদপন্থীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও গালাগালির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তাদেরকে হুমকিও দেয়। এমনকি অনেক সময় তারা পত্রিকার পাতায়ও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে। কি আর বলব, এ ধরনের বোকাদের প্ররোচনা এবং তাদের দাবীর বিচারকদের ব্যাপারে।

এমনকি যারা ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলে ও বিচার করে, তারা তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ ইসলাম পন্থীদের দমন করার জন্য ত্বগুতের পছন্দ মত ফতোয়া সংযোজন করে তারা এ কাজে অংশ নেয়। যেমন তারা মুজাহিদ বা ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে বলে, বিদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাকামী, খারেজী, মৌলবাদী, এরা ইয়াহুদী খ্রীস্টান হতে ইসলামের জন্য বেশি ক্ষতিকারক, এ ধরনের অনেক কথা বলে। আর আমি অনেককেই চিনি যারা, কাফিরদের বিরোধিতা করে কোন মুসলমান তাদের হাতে ধরা পড়লে তারা অনেক খুশি হয় এবং (ব্যঙ্গ করে) বলে, "সেটা কি সাংঘাতিক?" অথবা এমনও বলে, "তারা (কাফেররা) যা করছে, ভালই করছে," এ ধরনের অনেক কথা যা তাকে জাহান্নামে সত্তর বছর পথের সমান নিয়ে যায়। কিন্তু সে তা বুঝতেই পারে না।[১৩]

জেনে রাখুন, মিল্লাতে ইব্রহীমের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর অনেকগুলোই আমাদের যুগের দা'য়ীরা সংক্ষেপ করেছেন এমনকি কতকগুলো বাদ দিয়েছেন ও মেরে ফেলেছেন। যেমন,

- মুশরিক ও মুশরিকদের বাতিল উপাস্যদের সাথে শত্রুতার প্রকাশ।
- মুশরিকদের, তাদের উপাস্য, মত, বিধানের ও তাদের শিরকী আইন ও বিধানের মৌলিকতা ও সত্যতা অস্বীকারের কথা ঘোষণা করা।
- তাদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা, তাদের কুফরী অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘৃণা করা যতক্ষণ না তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং তা পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ না করে তা থেকে খালাস না হয় সেটাকে অস্বীকার না করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

---

[১৩] দ্রষ্টব্যঃ তিরমিযী ও ইবন মাজাহ-য় বর্ণিত, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে, যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'নিশ্চয়ই মানুষ এমন এতটি কথা বলে, যা সে মোটেও আপত্তিকর মনে করে না, অথচ সেটার জন্যই সে সত্তর বছর সময় ধরে আগুনে পড়বে।' আত-তিরমিযী বলেছেন, 'এই বর্ণনা অনুযায়ী হাদিসটি *হাসান গারীব*'। আল-আলবানী এটি সহীহ বলে আক্ষায়িত করেছেন।

ইব্‌রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের সমাজে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর। (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করার মানেই হলো তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রত্যেক সময় তাদের কাজকে শত্রুতা বশত পরিত্যাগ করা। (মিন বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ- ৩/৬৯)

- শাঈখ হামদ বিন আতীক (রহঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ **"প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হলো।"** **'শত্রুতা'** কে **'ঘৃণা'** এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হলো, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানুষ মুশরিকদের ঘৃণা করে ঠিকই তবে শত্রুতা পোষণ করে না। তাই তিনি এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে করে শত্রুতা ও ঘৃণা একই সাথে হয়। তবে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পষ্ট দু'টি নীতির আওয়ায। জেনে রাখুন, যদি ঘৃণা কেবল অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে তার প্রভাব ও নিদর্শন প্রকাশ না করা পর্যন্ত কোন উপকারই আসবে না। তেমনিভাবে শত্রুতা, যদি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা হয় তাহলে বুঝা যায় না। তাহলে এমতাবস্থায় শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ্যভাবেই করতে হবে।

- শাঈখ ইসহাক্ব বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, "শুধু অন্তরে কাফিরদের ঘৃণা করলে চলবে না। বরং শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে। তিনি সূরা মুমতাহিনার আয়াত উল্লেখ করে বলেন, আপনি বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যার পর আর কোন বক্তব্যের দরকার হবে না। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ **"প্রকাশ পেল, শত্রুতা ও ঘৃণা।** এই হচ্ছে দ্বীনের প্রকাশ। অবশ্যই উচিত হচ্ছে কাফিরদের সাথে স্পষ্টভাবে শত্রুতা করা ও তাদের সাথে প্রকাশ্যভাবে কুফরী করা এবং শারীরিক দূরত্ব সৃষ্টি করা (বিয়ে করা, সঙ্গম করা প্রভৃতি)। শত্রুতার অর্থ হচ্ছে শত্রুতার বিপরীত শত্রুতা করা। যেমন, সম্পর্ক ছিন্নের মৌলিকতা হলো, আন্তরিক ও জিহ্বা ও শারীরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর মু'মিনের অন্তর কখনো কাফিরের শত্রুতা শূন্য হয় না। প্রকৃত দ্বন্দ্ব কেবল প্রকাশ্য শত্রুতার দ্বারাই হয়। (জিহাদ পর্ব, ১৪১ পৃষ্ঠা)

- আল্লামা শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব '*ফাতহুল মাজীদ*' গ্রন্থের লেখক, সূরা মুমতাহিনার আয়াত সম্পর্কে বলেন, "যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো নিয়ে গবেষণা করবে সে ঐ তাওহীদ জানতে পারবে যা দ্বারা আল্লাহর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং বিরোধীদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে। যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন রাসূলগণ ও তাদের প্রকৃত ও ক্ষতিগ্রস্থ অনুসারীগণ। শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বলেছেন, "নবী (সঃ) কর্তৃক কুরাইশকে তাওহীদের দাওয়াত ও তাদের মূর্তির সমালোচনাকে (যেমন, সেগুলো কোন উপকার বা অপকার করতে অক্ষম) তারা গালি হিসেবে গণ্য করেছিল। যখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন তখন বুঝতে পারবেন যে, শুধু আল্লাহর

একত্ববাদ ঘোষণা ও শিরক বর্জন করলেই সঠিক ইসলামপন্থী হওয়া যায় না মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং প্রকাশ্য শত্রুতা ও ঘৃণার ঘোষণা না দেওয়া ব্যতীত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **তুমি কিয়ামাতের দিন এমন মু'মিন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে**। (মুজাদালা ৫৮ঃ ২২)

যখন আপনি এটা ভালভাবে বুঝবেন তখন জানতে পারবেন যে, অনেক লোক নিজেকে ধার্মিক বলে দাবী করে। অথচ দ্বীনের এগুলো সে জানে না। তবে তিনি ব্যতিত যিনি এ শাস্তি, বন্দি ও হাবশাতে হিজরতের মত কঠিন সময়ে মুসলমানদেরকে ধৈর্য ধরার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন অথচ তিনি সমগ্র মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দয়ার্দ্র ব্যক্তি। তিনি কোন ছাড় পেলে ছাড় দিতেন। তাহলে কি করে তাঁর উপর নাযিল হলো ঃ **মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক আছে তারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন আল্লাহর জন্য একটু কষ্ট পায় তখন মানুষের সাধারণ কষ্টকে আল্লাহর আযাব বলে গণ্য করে**। (আল-আনকাবুত ২৯ঃ ১০)

যে ব্যক্তি মুখের কথা দ্বারা সামান্য অভিযোগ করেছে তার ব্যাপারেও যদি এরূপ আয়াত অবতীর্ণ হয় তাহলে অন্যান্যদের অবস্থা কি? অর্থাৎ যারা তাদের মত চলে কথা ও কাজে কোন কষ্ট ছাড়াই। তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এবং তাদের হতে কষ্ট দূর করেছে এবং তাদের বিরোধীদের মতকে অগ্রাহ্য করেছে (যা আদ্-দুরার আস-সানিয়্যাহ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদ পর্ব, ৯৩ পৃষ্ঠা)

সুতরাং, আমি তাঁদের (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর নাতি, আব্দুর রহমান বিন হাসান, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন) বলতে চাই ঃ 'এটা ঠিক এমন যে আপনারা আমাদের সময়ের ব্যাপারে বলেছেন।'

- শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বলেন, "জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন তিনি যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন তা করার। কোন বান্দার ইসলাম, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতাকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ব্যতীত সঠিক হবে না।[১৪] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়ালীদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আল্লাহ বলেন ঃ **হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতৃগণ ও ভ্রাতৃগণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে ভালবাসে**। (আত-তাওবাহ ৯ঃ ২৩) (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ অধ্যায়, ২০৮ পৃষ্ঠা)

---

[১৪] যদি এর দ্বারা আসল শত্রুতা উদ্দেশ্য হয় তাহলে কথাটি সাধারণভাবেই প্রযোজ্য। আর যদি উদ্দেশ্য হয় ব্যাপক শত্রুতা তাহলে তা প্রকাশ করা, বিস্তারিত বর্ণনা করা এবং তা ঘোষণা করে দেওয়া। এ সমস্ত কথা বলা হয়েছে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার মূলকে বিলুপ্ত করা নয়। শাঈখ আব্দুল লতীফের তাঁর গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যার ইচ্ছা সেটা দেখে নিতে পারেন। তাতে তার কথা "যে ব্যক্তি শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের কথা বুঝল অথচ কাফিরদের সাথে শত্রুতাকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করল না তাহলে তার সে বুঝ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার মতামত বা চিন্তা চেতনা পথভ্রষ্ট বলে গণ্য করা হবে.... ।"

আর এটিই হচ্ছে সকল রাসূলগণের দ্বীন, এই হচ্ছে তাদের দাওয়াত ও দাওয়াতী পদ্ধতি যা সমগ্র আয়াত ও নবী (সঃ)-এর হাদীস প্রমাণ করে। তেমনিভাবে মুমতাহিনার ৪ নং আয়াত ঃ

...এবং তাঁর সাথে যারা ছিল...

অর্থাৎ ঐ সমস্ত রাসূলগণ যারা তাঁর দ্বীনের ও মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এটা একাধিক মুফাস্‌সির এই আয়াতের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।

- শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বলেন, এটিই হচ্ছে দ্বীনের প্রকাশ। দ্বীনের প্রকাশ সেটা নয় যেমনটি মূর্খরা ধারণা করে- যে ব্যক্তি কাফিরদের বর্জন করবে, নিজের ও কাফিরদের মধ্যে ফাঁক তৈরী করবে সালাত পড়বে, কুরআন পড়বে, যথা সম্ভব নফল ইবাদাত করবে সে তার দ্বীনের প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে। এটা মারাত্মক ভুল। বরং প্রকৃত দ্বীন প্রকাশকারী সেই যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় এবং তাদের সামনে বলতে কিছুই ছাড়েনা, চাই তাকে হত্যা করুক বা এলাকা হতে বিতাড়িত করুক না কেন। যেমন আল্লাহ কাফিরদের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ **এবং যারা কাফির তারা তাদের রাসূলগণকে বলেছে আমরা আমাদের ভূখণ্ড হতে তোমাদেরকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের মিল্লাতে (দলে) ফিরে আসবে।** (ইব্‌রাহীম ১৪ঃ ১৩)

  শুয়াইব (আঃ)-এর জাতির সংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ **হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে আমাদের গ্রাম থেকে বের করে দেব। অথবা তোমরা আমার ধর্মে (মিল্লাতে) ফিরে আস।** (আল-আরাফ ৭ঃ ৮৮)

  আল্লাহ আসহাবে কাহাফের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ **যদি এলাকাবাসী তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মারবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তোমরা কখনো তাদের সাথে বিরোধিতা করে সফল হবে না।** (কাহাফ ১৮ঃ ২০)

  কাফিরদের দ্বীনকে গালি দেওয়া, তাদের জ্ঞানকে অজ্ঞ বলে সম্বোধন করা ও তাদের প্রভুগুলোর ত্রুটি বর্ণনা করা ছাড়াই কি রাসূলগণের সাথে তাদের স্বজাতির শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করেছে? (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২০৭ পৃষ্ঠা)

- শাঈখ সোলায়মান বিন সাহমান মুমতাহিনার আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইব্‌রাহীম হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে বোকা।** (আল-বাকারাহ্‌ ২ঃ ১৩০)

তাই মুসলিমের কাজ হলো, আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা এবং শত্রুতা তাদের সাথে প্রকাশ করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও লেনদেন আচার ব্যবহার করা থেকে পূর্ণাঙ্গ দূরে থাকা। (জিহাদ পর্ব, ২২১ পৃষ্ঠা)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

.   .

তোমরা কি ভেবে দেখনা কিসের উপাসনা তোমরা করছ? তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমার শত্রু, একমাত্র রব্বুল 'আলামীন আল্লাহ ছাড়া। (শুয়ারা ২৬ঃ ৭৫-৭৬)

তৃতীয় এক স্থানে আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, বলেন ঃ

.

যখন ইব্‌রাহীম তাঁর পিতা ও জাতিকে বললেন, তোমরা যে জিনিসের ইবাদত কর আমি তা থেকে মুক্ত। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে অচিরেই সঠিক পথ দেখাবেন। (যুখরুফ ৪৩ঃ ২৬-২৭)

- আল্লামা শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাথে কুফরী করা, শত্রুতা ও ঘৃণা এবং জিহাদ করাকে ফরজ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ **যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে বলে দেওয়া কথাকে পরিবর্তন করে বলেছিল।** (আল-বাকারাহ্‌ ২ঃ ৫৯)

  তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব, সাহায্য সহযোগিতা করেছে। মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সাহায্য চেয়েছে। এজন্য তারা মু'মিনদেরকে ঘৃণা ও গালিগালাজ করেছে। এসব কাজই ইসলাম ভঙ্গের কারণ যা প্রমাণ করে কুরআন ও সুন্নাহ। এতে একটি সংশয় আছে যা প্রবীণ ব্যক্তিগণ করে থাকে, আর তা হলো, তাদের যুক্তি মিল্লাতে ইব্‌রাহীম হচ্ছে দাওয়াতী কাজের স্তরগুলোর মধ্যে সর্বশেষ স্তর। যার পূর্বে হিকমাত পূর্ণ অনেক দাওয়াতী মিশন হয়েছে এবং উত্তম দিক দিয়ে বিতর্কও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

  তাই হিকমাত ও নম্রতার সকল পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতিত কোন ব্যক্তির মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের আল্লাহর শত্রু ও তাদের মাবুদদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করণ এবং তাদের সঙ্গে কুফরী করা, শত্রুতা ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর শরণাপন্ন হওয়া যাবে না।

- আল্লাহর তাওফীক কামনা করে এর উত্তরে আমরা বলব, মিল্লাতে ইব্‌রাহীম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে এবং সাধারণ কাফিরদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি ও বিরোধিতাকারীদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতিদ্বয়কে এক করে ফেলার কারণে ঐ লোকগুলোর মধ্যে এ ধরনের সংশয় জন্ম নিয়েছে। আর এসব কিছুর মাঝেও মুসলমানদের কাফিরদের উপাস্য ও নীতিমালার ও শরীয়ত সম্পর্কিত অবস্থানের পার্থক্য সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে এমন হবে যে, মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ করা। আল্লাহ ছাড়া সকল মাবুদকে অস্বীকার করা। এতে দেরী করা বা সময় ক্ষেপণ

করা চলবে না। বরং এ ছাড়া শুরু করা যাবে না। কেননা, এটাই কালেমা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পূর্ণাঙ্গ রূপ, যা নাবোধক ও হ্যাঁ বোধক স্বীকৃতি চায়। আর এটিই হচ্ছে ইসলামের মূলবিষয় এবং নবী রাসূলগণের দাওয়াতের আসল পদ্ধতি। তাই আপনার সাথে সংশয় নিরসনে দুটি ফায়সালা তুলে ধরা হলো ঃ

- **প্রথমতঃ** আল্লাহদ্রোহী শক্তি ও আল্লাহ ছাড়া সে সকল উপাস্যের ইবাদত করা হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। সেগুলোকে অস্বীকার করা। যা করতে দেরী বা সময় ক্ষেপণ করা যাবে না। বরং পথের শুরুতেই তা ঘোষণা করা উচিত।

- **দ্বিতীয়তঃ** মুশরিক সম্প্রদায় হতে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যদিও তারা তাদের বংশধর হোক না কেন। যদি তারা তাদের বাতিলের উপর অটল থাকে। যা আপনার জন্য বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

প্রথম ফায়সালা ঃ সেটি হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত ত্বাগুতের ইবাদত করা হয় সেগুলোর সাথে কুফরী করা। চাই তা গুলগুলী পাথরের মূর্তি হোক অথবা সূর্য, চন্দ্র, কবর, গাছ, মানব রচিত শরীয়াত ও আইন কানুন হোক না কেন। মিল্লাতে ইব্‌রাহীম ও নবী রাসূলগণের দাওয়াত এ সমস্ত উপাস্যের কুফরী করা, তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে বলে। এর সম্মানকে বোকামী, মূল্যকে হ্রাস, এর জালিয়াতী এবং দোষত্রুটি প্রথম থেকেই বর্ণনা করা। এরূপই ছিল নবীগণের অবস্থা। যখন তারা তাদের জাতির জন্য দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করতেন। এ কথা বলতেনঃ

আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগুতকে বর্জন কর। (আন্-নাহাল ১৬ঃ ৩৬)

এ ব্যাপারে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একনিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

তোমরা কি ভেবে দেখনা কিসের উপাসনা তোমরা করছ? তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা আমার শত্রু, একমাত্র রব্বুল 'আলামীন আল্লাহ ছাড়া। (শুয়ারা ২৬ঃ ৭৫-৭৬)

সূরা আল-আন্‌আমে তাঁর বাণী ঃ

হে আমার জাতির লোকজন! শুনে রাখ, তোমরা যার সাথে শিরক কর আমি সেগুলো হতে মুক্ত। (আল-আন্‌আম ৬ঃ ৭৮)

আল্লাহর বাণী ঃ

.

যখন ইব্‌রাহীম তাঁর পিতা ও জাতিকে বললেন, তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি বাদে। তিনি আমাকে অচিরেই সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। (যুখরুফ ৪৩ঃ ২৬-২৭)

তেমনিভাবে ইব্‌রাহীমের (আঃ) সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

তারা বলল এক যুবককে এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি। যাকে ইব্‌রাহীম বলে ডাকা হয়। (আল-আম্বিয়া ২১ঃ ৬০)

মুফাস্‌সিরগণ **"এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি"** এর ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি সেগুলোর দোষ ত্রুটি বর্ণনা করতেন, ঠাট্টা করতেন এবং সেগুলোর অসারতার কথা বলতেন। কুরআন ও সুন্নাহ এর প্রমাণে পরিপূর্ণ। আমাদের জন্য নবী (সঃ)-এর মাক্কী জীবনের আদর্শই যথেষ্ট। তিনি কিভাবে কুরাইশদের উপাস্যগুলোর অসারতা ও তার থেকে তাঁর সম্পর্কহীনতা প্রকাশ এবং সেগুলোর সাথে কুফরী করার কাজ সমাধা করতেন। এমনকি তারা নবী (সঃ)-কে 'বেদ্বীন' হয়ে গেছে বলেও অভিযুক্ত করত। যদি এ ব্যাপারে আরো মজবুত ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে চান তাহলে মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ আয়াতগুলো পড়ুন।

তখন যে সব আয়াত নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হতো তা পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণের মানুষের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করত, যা মানুষের মুখে মুখে, বাজারে মজলিসে, এবং তাদের সংসদে সর্বদা আলোচিত হতো। আর এ আয়াতগুলোই আরবদের বোধগম্য নিজস্ব আরবী ভাষায় তাদের সম্বোধন করত। স্পষ্টভাবে তাদের উপাস্যগুলোর অসারতা বর্ণনা করত বিশেষ করে লাত, উজ্জা, মানাতে ছালেস প্রভৃতির। তদানীন্তন যুগের উপাস্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাকর ও বড় উপাস্য বলে এগুলো বিবেচিত হত। সেগুলোর সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা তিনি দিতেন। সেগুলোর সাথে মেলামেশা না করা ও তার প্রতি অসন্তুষ্টির কথা নবী (সঃ) কোন প্রকার গোপন না করে খোলাখুলি বলে দিতেন। কেননা তিনি একজন ভয় প্রদর্শককারী ব্যতিত আর কিছুই নন। যারা বর্তমানে দাওয়াতী কাজে ভূমিকা রাখেন তাদের এ ব্যাপারগুলো ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন। নিজেদেরকে এর সাথে হিসাব মিলাতে হবে। কেননা দাওয়াতের দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করার চেষ্টা চালানো হয়। তাই সেটা যেন এমন পদ্ধতিতে না হয় যাতে নবী রাসূলগণের পদ্ধতির সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

আর আমরা বর্তমান যে সময়ে বাস করছি তা সংবিধান ও আইন কানুনে শিরক সম্প্রসারণের যুগ যা আমাদের সামনেই ঘটতেছে। অতএব এ দাওয়াতী কাজের কর্তব্য হলো মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করে তাঁর নবীর প্রতি সমবেদনা জানানো। এ ধরনের সংবিধানের ও আহ্বানের দোষত্রুটি মানুষের নিকট তুলে ধরা এবং অস্বীকার করা এবং তার সাথে শত্রুতা প্রকাশ করা ও ঘোষণা করা এবং মানুষকে এদিকে আহ্বান করা ও এ সমস্ত হুকুমাতের মুখোস বর্ণনা করা ও তা মানুষের সামনে হাসির পাত্র হিসাবে চিহ্নিত করা।

এ কাজ ছাড়া আর কিভাবে সত্য প্রকাশ পাবে ? আর মানুষেরাই বা কিভাবে তাদের দ্বীনকে সঠিকভাবে জানবে আর বাতিল থেকে হাক্ব ও শত্রু থেকে বন্ধুকে চিহ্নিত করবে যেখানে দাওয়াত সংস্করণ ও ফিতনার দ্বারা প্রভাবশালীরা সঠিক দাওয়াতী কাজের গতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অর্থাৎ বড় ফিতনা হচ্ছে তাওহীদকে গোপন করা এবং জনগণের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া। মিল্লাতে ইব্‌রাহীম প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর দ্বীনের সাথে সুসম্পর্ক প্রকাশ এবং আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করা হয় এমন ত্বগুতের সাথে শত্রুতাপোষণ করার চেয়ে কোন সংস্কার বড় হতে পারে? এ জন্য যদি মুসলমানেরা পরিক্ষিত না হয়, আর এ জন্য যদি কুরবানী না দেয় তাহলে আর কিসের দ্বারা তাদের পরীক্ষা হতে পারে ? ইসলামের অংশ হিসেবে শাহাদাতের প্রচার ও প্রসারে প্রত্যেক ত্বগুতের সাথে কুফরী করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। তা ঘোষণা করা, শুরু করা, প্রকাশ করাও বড় ওয়াজিব। অবশ্যই তা মুসলমানদের দাওয়াতে বহুল প্রসার লাভ করবে। অথবা কমপক্ষে প্রত্যেক দলের একটি ক্ষুদ্রদল তা প্রচার ও প্রসার করবে।

যাতে করে তাদের দাওয়াত প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হয়ে যায় এবং তা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য হয় যা দ্বারা তাদেরকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমনটি ছিল নবী রাসূলগণের অবস্থা। এ কাজ নিজের অবস্থা দুর্বল থাকলেও করতে হবে। যেমন তারা তাঁর দিকে আঙুল তুলে কথা বলত এবং তাদের উপাস্যের সমালোচনা করার জন্য হুমকিও দিত তবুও ইব্‌রাহীম (আঃ) বিরত থাকেননি। আমরা অবাক হয়ে যাই এটা আবার কোন দাওয়াত যা সংস্কারের জন্য এ দা'য়ীগণ কান্নাকাটি করে। তারা কোন দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করতে চায়? তাদের অধিকাংশই তৈরী করা আইনের প্রশংসায় নিবেদিত প্রাণ। এটা কতই না মুসিবতের কথা- আবার তাদের কেউ কেউ এর সুনামও করে এবং এর পবিত্রতার সাক্ষী দেন। অনেকেই এর পবিত্রতার উপর শপথ করে তার বুনিয়াদী ও সীমারেখা মেনে চলে। যা সমাধানের ও পথের বিপরীত। তারা শত্রুতা ও কুফরী প্রকাশের পরিবর্তে তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও ভাল সম্পর্ক রাখে। এরাই কি তাওহীদ প্রচার করবে? দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে? এ কাজ শুরু করা ও প্রকাশ করার বিচারককে অস্বীকার অথবা তার বিচারের উপর অটল থাকা যে বিচার আল্লাহর শরীয়ত পরিপন্থী এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কেননা এটা সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত অথবা শরীয়ত বা নিয়ম কানুনের সাথে যা জনগণের মাঝে মর্যাদার সাথে সমাদৃত।

দ্বিতীয় সমাধান ঃ মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদেরকে অস্বীকার করা। তাদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা অন্তর থেকে।

- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) *"ইগাসাতুল লিহফান"* গ্রন্থে বলেন, "এই বড় শিরক হতে মুক্তি পাবে না একমাত্র আল্লাহর জন্য তাওহীদকে আলাদা করা, মুশরিকদের সাথে আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর কাছে তাদের ঘৃণ্য অবস্থা সৃষ্টি করা ব্যতীত।" এ ধরনের সমাধান শাঈখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাও দিয়েছেন বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রথমটি হতে (অর্থাৎ তাদের মাবুদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে)।

- হামদ বিন আতীক (রহঃ) *"সাবিল আল-নিযাত ওয়াল ফিকাক"* গ্রন্থে **"আল্লাহ ছাড়া তোমরা যা কিছুর ইবাদত কর সেগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।"** (মুমতাহিনা আয়াত ৪৩) আল্লাহর এ বাণীর প্রেক্ষিতে বলেন, এখানে একটি চমৎকার বিষয় আছে, সেটি হলো, আল্লাহ তা'আলা গাইরুল্লাহর উপাসনাকারী মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা আগে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ ছাড়া যেসব মূর্তির ইবাদত করা হয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্বে। কারণ প্রথমটিই দ্বিতীয়টির চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যদি মূর্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এর উপাসকের সাথে যদি সম্পর্ক রাখে তাহলে তো তার উপর অর্পিত ওয়াজিব সে পালন করতে পারবে না। আর যদি মুশরিকদের সাথেই সম্পর্ক না থাকে তাহলে আপনা আপনিই তাদের মূর্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর কথাও এরূপ ঃ **আমি তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব।**[১৫] এখানে তাদের মূর্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্নের পূর্বেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের কথা বলা হয়েছে। তেমনি আল্লাহ আরো বলেন ঃ **যখন ইব্রাহীম তাদেরকেও আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের ইবাদত করত সেগুলো হতে আলাদা হয়ে গেলেন।**[১৬] আল্লাহর আরও একটি বাণী ঃ **এবং যখন তারা তাদের এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করত তা থেকে আলাদা হয়ে গেলেন।** (কাহাফ ১৮ঃ ১৬)

হে পাঠক! আপনার উচিত এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা। তাহলে এ আয়াতগুলোই আপনার জন্য আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করার পথ খুলে দেবে। অনেক মানুষই আছেন নিজে শিরক করেন না। কিন্তু মুশরিকদের সাথে শত্রুতাও করেন না। এভাবে মুসলিম হওয়া যাবে না; যদি সমগ্র রাসূলগণের দ্বীনের অনুসরণীয় পদ্ধতি পরিহার করেন?[১৭]

---

[১৫] মারইয়াম ১৯ঃ ৪৮

[১৬] মারইয়াম ১৯ঃ ৪৯

[১৭] এ বক্তব্য দ্বারা শাইখের উদ্দেশ্য (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) সার্বিকভাবে তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা রাখা, প্রয়োজনে অন্তর দিয়ে। বরং যদি অন্তরে তাদের জন্য আন্তরিকতা, ভালবাসা থাকে তবে কোন সন্দেহ নেই যে, তার ঈমানে ঘাটতি হয়েছে এবং রাসূলের সমগ্র নীতি পরিহার করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **"তুমি এমন কোন দল পাবে না যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে (অথচ) তারা আল্লাহ ও তার রাসূরের বিরোধীদের সাথে মুহব্বত করে।"**

- শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান তার *'আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ'* গ্রন্থে বলেন, "যে ব্যক্তি শিরক থেকে বেঁচে থাকে ও তাওহীদকে ভালবাসে। কিন্তু মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে ও তাওহীদপন্থীদের সাথে বন্ধুত্ব ও সাহায্য বর্জন করে, সে তার এ তাওহীদকে দুষিত করে ফেলে। সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায় শিরকের এমন ঘাঁটিতে যা তার নির্মিত দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়। তাওহীদের মৌলিক বিষয় ও শাখা সমূহ পরিত্যাগ করে। এর সাথে যে ঈমানে সন্তুষ্ট প্রকাশ করা যায় তা বাকি থাকে না। সে আল্লাহর জন্য ভালবাসে না। ঘৃণাও করে না এমনকি তার জন্য শত্রুতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলে না অথচ তিনি তাকে সৃষ্টি ও বড় করেছেন। আর এগুলো সবই গ্রহণ করা হয় শাহাদাত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকেই। (জিহাদ পর্ব, ৬৮১ পৃষ্ঠা)

- ঐ একই গ্রন্থে তিনি আরও বলেনঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভে উত্তম পদ্ধতি হলো তার শত্রু মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ, ঘৃণা ও সংগ্রাম করা। এ কাজের দ্বারা বান্দা মু'মিন ব্যতিত অন্যের বন্ধুত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যদি এ কাজ না করে তাহলে সে পূর্বে বর্ণিত রাসূলগণের নীতি পরিত্যাগকারী রূপে গণ্য হবে। তাই ইসলামকে বিনষ্টকারী ও তার মূল উৎপাটনকারী কাজ থেকে সাবধান! সাবধান! (৮৪২ পৃষ্ঠা)

- সুলাইমান বিন সাহমান বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, বন্ধুত্ব পরিহার, ঘৃণা করল না এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাহলে সে ব্যক্তি নবী আহমাদের অনুসৃত পথে থাকবে না। এমনকি সঠিক পথেও সে থাকবে না।"

- এবং শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের (রহঃ) কথা, অবশ্যই মুসলিমের কর্তব্য হলো মুশরিকদের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলে দেওয়া। কেননা সেও এ মু'মিন সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। এতে করে দলটির অবস্থান মজবুত হবে আবার সেও শক্তিশালী হবে। আর ত্বগুতী শক্তি ভয় পাবে। যারা শত্রুতার চরম সীমায় পৌঁছেছে এমনকি তাদের নিকট যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই গোত্রটি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের দুই পুত্র শাঈখ হুসাইন ও শাঈখ আব্দুল্লাহকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে এ দ্বীনে দীক্ষিত হলো, এ দ্বীন ও তাঁর অনুসারীদের ভালবাসল, কিন্তু মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করল না অথবা শত্রুতা পোষণ করল কিন্তু তাদেরকে অস্বীকার করল না তার হুকুম কি? তারা উভয়ে যা উত্তর দিয়েছিলেন তা হলো, যে বলবে আমি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি না। অথবা শত্রুতা করি কিন্তু তাদেরকে অস্বীকার করি না? সে মুসলিম নয়? সে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ **...তারা বলে, আমরা কতকগুলো বিষয়ে ঈমান রাখি ও কতকগুলো অস্বীকার করি এবং তারা এর মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করতে চায়। তারা প্রকৃত কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।** (আন্-নিসা ৪ঃ ১৫০-১৫১)

- সুলাইমান বিন সাহ্‌মান (কবিতার ছলে) বলেন ঃ

"যারা মুহাম্মাদের (সঃ) দ্বীনের শত্রুতা করে, তাদের সাথে শত্রুতা কর ।
আর যারা (এই দ্বীনকে) ভালবাসে তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন কর, প্রত্যেক হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি সাথে ।
যে মু'মিন তাকে আল্লাহর ভালবাসার জন্য ভালবাসো ।
আর অবাধ্যদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা থাকার কারণে তাদের ঘৃণা কর ।
প্রকৃত দ্বীন হচ্ছে ভালবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব করা,
আর অনুরূপভাবে, সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রত্যেক পথভ্রষ্ঠ ও সীমালংঘনকারীর সাথে ।"

স্বভাবগতভাবে আমরা যেন না বলি, নিশ্চয় এই সম্পর্কহীনতা ও শত্রুতা প্রকাশের সাথে তাদের মন আকৃষ্ট করাও শামিল আছে । অথবা তারা গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করে কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের জন্য শত্রুতা প্রকাশ করে না । প্রত্যেক মুশরিকের অন্তরে যদি এ ধরনের বিশ্বাস থাকা ওয়াজিব হতো তাহলে তারা শিরক হতে পবিত্র হতো । কিন্তু প্রকাশ করা, ঘোষণা দেওয়া, পরিত্যাগ করা, শুরু করা এগুলি তখনই শুরু করতে হবে । এমনকি প্রথমে স্বৈরাচার ও অত্যাচারীদেরকে উত্তম কথা ও হিকমতের সহিত আল্লাহর অনুগত্যের দাওয়াত দিতে হবে ।

যদি তা গ্রহণ করে তাহলে তারা আমাদের দ্বীনি ভাই বলে গণ্য হবেন । তাদের আনুগত্যানুযায়ী তাদেরকে আমরা ভালবাসব । তাদের যে অধিকার থাকবে আমাদের তা থাকবে । তাদের উপর আমাদের সে অধিকার থাকবে তাদেরও আমাদের উপর সে অধিকার থাকবে । স্পষ্টভাবে দলিল প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যদি মানতে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে এবং তারা যে বাতিল ও শিরকের উপর ছিল তার উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতায় সক্রিয় হয় তাহলে তাদের সাথে আর সৌহার্দ মূলক আচরণ ও নরম ভাষায় কথা বলা চলবে না । তখন তাদের সাথে প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে ।

আর উচিৎ হবে কাফের মুশরিকদের হিদায়াত দ্বীনের সাহায্যকারী সংগ্রহ, দাওয়াতী কাজে নম্রতা ও হিকমাত প্রয়োগ ও উত্তম বাণী ব্যবহার করার সাথে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ভালবাসা, ঘৃণা করা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা । কেননা অনেকে দুটি অবস্থাকে এক করে ফেলেন । যার কারণে কুরআন হাদীসের অনেক ভাষাই তাদের জন্য বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে । যেমনঃ "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে সঠিক পথ দেখাও । কেননা তারা বুঝে না ।" এ ধরনের অনেক আয়াত ও হাদীস আছে ।

ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর অতি নিকট আত্মীয় স্বজনের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তখন যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তারা শিরক ও কুফরীর উপর অটল থাকবে । তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সে (তাঁর পিতা) আল্লাহর দুশমন, ইব্‌রাহীম তার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন ।" (আত-তাওবাহ ৯ঃ ১১৪)

এ কাজ করেছেন হিকমাত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা তাকে দাওয়াত দেওয়া এবং পুনঃ পুনঃ দেওয়ার পরও যখন গ্রহণ না করেছিল তখন। যেমন তাঁর পিতাকে সম্মোধন করে বলেছেন ঃ

হে আমার পিতা আমার কাছে জ্ঞান (নবুওয়াত) এসেছে। তাই আমার অনুসরণ করুন ...
(মারইয়াম ১৯ঃ ৪৩)

হে আমার আব্বা! আমি ভয় করছি দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে ...
(মারইয়াম ১৯ঃ ৪৫)

এভাবে মুসা (আ) ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তাকে তার কাছে রাসূল হিসাবে পাঠানোর পর। আল্লাহ বলেছেনঃ

তোমরা উভয়ে ফিরাউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। হয়তো আল্লাহকে স্বরণ করবে অথবা ভয় করবে। (ত্বা হা ২০ঃ ৮৪)

আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য মূসা (আ) তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেনঃ

.

আপনার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে? তাহলে আমি আপনাকে আপনার রবের পথ দেখাব। অতএব আপনি তাকে ভয় করুন। (নাজি'আত ৭৯ঃ ১৮-১৯)

অতঃপর তাকে অনেক নিদর্শন ও প্রমাণ দেখালেন। যখন মূসার (আঃ) এর নিকট ফিরআউনের মিথ্যা, শত্রুতা, বিরোধিতা ও বাতিলের উপর অটল থাকার কথা প্রকাশ পেল। তখন মূসা (আঃ) বললেনঃ

আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, এগুলো কেবলমাত্র ভুমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের রবই অবতীর্ণ করেছেন তবুও মানলেন না। তবে আমি মনে করি হে ফিরআউন আপনি একজন ধ্বংসশীল লোক। (বানী ইসরাঈল ১৭ঃ ১০২)

বরং তাদের উপর এ বলে বদদু'আ করলেন ঃ

হে আল্লাহ! তুমি ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে পার্থিক জীবনে ধন ও সৌন্দর্য্য দান করেছো। হে রব! তারা যেন তোমার পথ থেকে পথভ্রষ্ঠ হয়। আল্লাহ তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দাও। তাদের অন্তর শক্ত করে দাও। যাতে ঈমান আনতে না পারে। কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত। (ইউনূস ১০ঃ ৮৮)

যারা নম্রতা, সহজতা মুতলাক আয়াতগুলো দ্বারা গুণগুণ করে এদিক সেদিক কিছু বলতে চান ও তার অপব্যাখ্যা করতে চান এবং তা অপপ্রয়োগ করতে চান তাদের উচিৎ এই লম্বা বিবরণটিতে থেমে যাওয়া ও চিন্তা ভাবনা করা এবং একে ভাল করে বোঝা যদি তারা সত্যনিষ্ট হন।

এরপর তারা যেন ভালভাবে জেনে নেয়, নম্রতা ও ভদ্রতার সকল পথ। যেমন চিঠিপত্র, বইপুস্তক, সরাসরি ও দাওয়াতী কাজের যত পথ আছে তা প্রয়োগ করার পরও যদি দা'য়ীর নিকট প্রকাশ পায় যে, সে বিধান মানবে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতিত অন্যগুলোকে তাহলে সে কুফরী করল এবং যদি জানে আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া বিধান মানা বৈধ নয় তবুও সে তা মানে এবং অহংকার করে। যদিও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গতি হয়েছে দরিদ্রদের শোষণ করে বিভিন্ন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও মধুর কথা ও ভুয়া জাল দলীল প্রমাণ পেশ করে হয়। তাদের জিহ্বা দ্বারা শুধু মিথ্যাই বের হয়। এগুলোতে সম্মতি ও নীরবতা দেশে কুফর ও ফাসাদ বৃদ্ধিতে এবং দেশের জনগণকে দিন দিন দাসে পরিণত করতে ভূমিকা পালন করে এবং এ সংবিধান মু'মিন ও দা'য়ীদের উপর কঠোরতা আরোপ করে। সংস্কারকদের পথকে সংকীর্ণ করে তাদের পিছনে পুলিশ ও গোয়েন্দা দ্বারা গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে। আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীদের মধ্যে এর বিস্তৃতি ঘটানো। ফাসাদের মাধ্যমকে সহজলভ্য করা, আল্লাহর শত্রুদের জন্য ফাসাদ সৃষ্টি করা, তাদের ফাসাদ ও নাস্তিকতা করার সুযোগ দেওয়ার তথা প্রযুক্তির ব্যবস্থা করাও সরকারগুলোর কাজ। আর আইন প্রণয়ন, যেই শিরকী আইন কানুন মানুষের কেবল দুর্ভোগ বাড়ায় অথবা কুফরী ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করা অথবা তার ত্রুটি বর্ণনা করা অথবা মানুষের জন্য বাতিল কিছু উত্থাপন করা।

আর বিচারকগণ মানুষের রক্ত, সম্পদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই মানব রচিত আইন দিয়েই বিচার করে। যা স্পষ্ট কুফরীতে ভরপুর। তাহলে এ ধরনের লোকদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা, ভাল ব্যবহার করা, অথবা সুন্দর নামে ভূষিত করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া, তাদের ও তাদের হুকুমাতের প্রতি সমর্থন দেওয়া ঠিক নয়। বরং ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথীরা যা বলেছিলেন তাদের জাতিকে সে কথা বলা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। তোমাদের, তোমাদের সংবিধান, শিরকী আইন ও কুফরী হুকুমাতের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের সাথে কুফরী করলাম। চিরদিনের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা শুরু হলো।

যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ কর এবং একমাত্র আল্লাহর শরীয়াতের অনুসরণ কর। এরই শামীল হলো তাদের উপাস্য থেকে বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকা তাদের আনুগত্যে প্রবেশ ও তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ, তাদের বাহনে চলা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের আধিক্যতা হতে, যা তাদের বাতিলকে চিহ্নিত করে অথবা তাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে অথবা তাদের বাতিল আইন প্রয়োগ করবে। যেমন সৈন্য, পুলিশ ও গবেষণা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে।

সমসাময়িক নেতাদের সাথে (যারা কোন অবস্থায় এ ত্বগুতের নৈকট্য পরিত্যাগ করে সঠিক পথে আসেনি) সালাফগণের অবস্থান ছিল প্রত্যয়ী, স্পষ্ট ও পরিষ্কার কিন্তু আমাদের সময়ের অনেক দা'য়ীর জায়গায় সে অবস্থান কোথায় ? এদের প্রসিদ্ধি এবং তাদের জন্য তাদের অনুসারীদের করতালী সত্ত্বেও ঐ সমস্ত সালাফগণতো পলিটিক্যাল সাইন্স (রাজনৈতিক বিজ্ঞানে) ডিগ্রী নেননি। তারা শত্রুদের ষড়যন্ত্রে ভরপুর দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনও পড়তেন না, এ সত্ত্বেও তারা বাদশাহদের ও তাদের দরবার হতে দূরে থাকতেন। বাদশাহরাই তাদের ডেকে পাঠাতেন এবং ধন-সম্পদ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে হাদিয়া দিতেন। আর আজকাল যারা তাদের নিকট ধর্ণা দেয়, তাদের দ্বীন নিয়ে শয়তান খেলে। তারা তাদের দীনকে নষ্ট করে দুনিয়াবী সমৃদ্ধি কামনা করে।

তারা বাদশাহদের কাছে তাদের দ্বারে আসে আর বাদশাহ তাদের অপমান করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। সালাফীগণ আমীরদের অন্যায়ে ঢুকতে নিষেধ করেছেন। এমন হতে পারে, যে তাদের সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে যাবে সেই তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভয়ে তাদের সাথে নরম নরম কথা বলবে, তাদের সম্মান করার জন্য ভাল ব্যবহার করতে শুরু করবে। অথবা তাদের কতক বাতিল জিনিসের ব্যাপারে নিরবতা পালন করবে এবং তাকে মেনে নিবে। সালাফগণ মনে করেন, তাদের থেকে দূরে থাকা ও সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের অবস্থাকে অপছন্দ করাই ভাল। সুফিয়ান সাওরীর কথা শুনে রাখুন যা তিনি উবাদ বিন উবাদকে লিখেছেন, তিনি তার চিঠিতে বলেন, "আমীর উমরাদের নিকট যাওয়া থেকে বেঁচে থাক অথবা কোন ব্যাপারে তাদের সাথে মেলা মেশা করা থেকে। তোমাকে বলা হবে সুপারিশ কর অথবা অত্যাচারীর প্রতিশোধ নিয়ে দাও। অথবা অন্যায়কে প্রতিহত কর। এগুলো করা থেকেও বেঁচে থাক। কেননা এগুলো ইবলিসের ধোঁকা। তিনি তা মেনে চলেছেন। তাই সম্মানিত পাঠক তিনি নিরাপত্তা পেয়েছেন।" (সিয়ারে আলামে নুবালা- ১৩/৫৮৬) (*জামে বায়ানুল ইল্‌মি ওয়া ফায্‌লিহি* পৃষ্ঠা- ১/১৭৯)

সুফিয়ান (রহঃ) এর দিকে দেখুন, আজকের দা'য়ীরা দাওয়াত সংস্কারের যে নামকরণ করেছে তার সম্পর্কে বলেন, "ইব্‌লিসের ধোঁকা"। এগুলো যে করে তাকে কিছু বলেননি। যা বর্তমান যুগের অনেক দা'য়ীই করে থাকেন। যারা তাদের জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে দাওয়াতকে সংস্কার করার দাবীতে এবং দ্বীনের শত্রু ও বিরোধীদের নিকট দ্বীনের জন্য সাহায্য চেয়ে- না ভাই এ কাজ করবে না। তোমার প্রাপ্য নির্ধারিত হয়েছে। তাদের নিকট ঘোরা ফেরা করার ক্ষেত্রে কারণ হলো, হয়তো কোন পদ বা গদি পাবে। তাদের মন্ত্রিসভায় ও জাতীয় সংসদে পদ পাবে বলে। হয়তো অত্যাচার কম হবে অথবা তোমার ভাইয়েরা উপকৃত হবে। আর বদ-পাপী, বদকার ও ভণ্ড লোকদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য ছেড়ে দিবে না ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার ঐগুণ বর্ণনা করার কারণ হলো দুনিয়াতে পাপিষ্ট পাঠক হতে বাঁচা। এ অবস্থা যদি তার সময়ে হয় তাহলে আমাদের সময় কি অবস্থা হতে পারে। আল্লাহর কাছে এ থেকে মুক্তি কামনা করি। আর বর্তমান যুগের মানুষের অনিষ্ঠ হতে আশ্রয় চাই এবং তাদের ইবলীসি কর্মকাণ্ড থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি।

আল্লাহ তাকে দয়া করুন, যিনি বলেছেন,

"তুমি এমন একদল লোককে দেখতে পাবে যারা,
প্রত্যেক কুফরী মতবাদ ও খারাপ কাজ করে এমন মজলিসের অনুগত ।
বরং তাতে কুরআনের আইনের পরিবর্তে খ্রিস্টীয় আইন দিয়ে বিচার কার্য সমাধা করে ।
তোমাদের মত চাটুকার লোকদের অমঙ্গল থেকেও ধ্বংস হয়,
যারা তর্ক-বির্তক প্রিয় ও সুলতানদের ঘুষ গ্রহণ করেছে ।"

- সুফিয়ান আস-সাওরী হতে বর্ণিত এই কথাটি শাঈখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বার বার পড়তেন । যে ব্যক্তি বিদ'আতীর সাথে উঠা-বসা করবে সে তিনটির যে কোন একটি থেকে নিরাপদ থাকবে না । তা হলো ঃ

১ - বিদ'আতীর সাথে উঠাবসার কারণে সেও বিদ'আতের ফিতনায় পড়বে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

"*যে ব্যক্তি ইসলামে একটি সুন্দর নীতির প্রবর্তন করল সে তার নেকী এবং যারা তা আমল করবে তাদের সমপরিমাণ নেকী পাবে ও আমলকারীদের নেকী হ্রাস না করে । আর যে ব্যক্তি ইসলামে একটি অসৎ কাজ প্রবর্তন করল সে তার গুনাহ ও যারা সে পাপ কাজ করবে তাদের গুনাহেরও ভাগী হবে, তবে তাদের গুনাহ কোন কমবেশী করা হবে না ।*" (মুসলিম)

২ - তাদের প্রতি তার অন্তরে কিছুটা হলেও সহমর্মিতা হবে । এর দ্বারাই তার পতন হবে । এ কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দিবেন ।

৩ - অথবা বলবে, 'আল্লাহর কসম, তারা যা বলে আমি তাকে পরোয়া করি না, আমি আমার নিজের অবস্থানে সবল আছি । যে নিজের দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে গ্যারান্টি দেয় তা আল্লাহ চোখের পলকের নিমিষে ছিনিয়ে নিতে পারেন ।'

বিদ'আতীদের সাথে উঠাবসা করার কারণেই যদি এ ধরনের উক্তি তারা করে থাকে যদিও তাদের বিদ'আতগুলো কুফরী পর্যায় ছিল না বলে বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণ পাওয়া যায় । তাহলে মুরতাদ, মানব রচিত আইন মান্যকারী ও মুশরিকদের সাথে উঠাবসার পরিণাম কি হতে পারে? সুফিয়ান সাওরীর তৃতীয় কথাটি চিন্তা করে দেখুন ঃ "আমি আমার নিজের অবস্থানে সবল আছি । দ্বীনিয়াতে কোন সমস্যা হবে না ।" এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে, বর্তমান যুগের অনেক দা'য়ী এ ধরনের কথা ও কাজে পতিত হয়েছে । সুতরাং, সাবধান হও! এবং (আবারও) সাবধান হও! আল্লাহ এ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন ।

প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের বক্র পথগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন যেগুলোতে তার অনুসারীদেরকে কুটকৌশল অবলম্বন করতে বলা হয় । এর উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের সাহায্য করা । আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কোন সাহায্য বা সংস্কার অজ্ঞতার ও অন্যায়ের দ্বারা কখনো তার কাম্য নয় । আল্লাহ সূরা হুদে নবী (সঃ)-কে বলে দিয়েছেনঃ

যারা অন্যায় করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না, তাহলে তোমাদেরকেও আগুন স্পর্শ করবে। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। যদি কর তাহলে তোমাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না। (হুদ ১১ঃ ১১৩)

এ ধরনের চাটুকারিতা ও বক্র পথের পিছনে দ্বীনের কোন উপকার বা কল্যাণ নেই যদিও ধারণাকারীরা ধরণা করে থাকে। আল্লাহ! তাদের এ কল্যাণকামিতা যেন আবার তাদের আগুন স্পর্শকারী না হয়ে দাঁড়ায়? ঘুম থেকে জেগে উঠ, প্রত্যেক হাক ডাককারীর ধোঁকায় প্রভাবিত হইও না।

- তাফসীর কারকগণ "**তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না**" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের দিকে সহজ হয়ো না।
- আবুল আলীয়াহ বলেছেন, তাদের প্রতি ভালবাসা ও নরম নরম কথা দ্বারাও ঝুঁকে পড় না।
- সুফিয়ান ছাওরী বলেছেন, যে তাদেরকে কালির দোয়াত দিবে, বা পেনসিল কেটে দিবে, অথবা কাগজ তুলে দিবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে (যাদেরকে উপরোক্ত আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে)।
- শাঈখ হামদ বিন আতীক বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে উঠা-বসার জন্য আগুন স্পর্শ স্পষ্ট করবে, সে হুমকি দিয়েছেন। যদিও সে মেলামেশায় নরম ভাষায় কথা বলা হয়।
- শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) [তিনি নাজদের সালাফী দাওয়াতের একজন অন্যতম ইমাম] মুফাসসিরদের পূর্বোক্ত উক্তিগুলো উল্লেখ করার পর "**ঝুঁকে পড়া**" এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, এটা এজন্য যে, কেননা শিরকের গুনাহ সবচেয়ে বড় গুনাহ। যাতে বিভিন্নভাবে আল্লাহর নাফারমানী করা হয়। তাহলে কি করে এর সাথে আরো অপরাধ যোগ করে আল্লাহর আয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করা, আল্লাহর হুকুম ও আদেশকে অপসারণ করা, আবার যা এর বিরোধী সেগুলোকে ন্যায়সঙ্গত বলে মানা যায়।

  আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মু'মিনরা জানেন এগুলো কুফরী কাজ, মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা। যার সামান্যতম আত্মমর্যাদা বোধ ও অন্তরে প্রাণশক্তি আছে সে কি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব ও দ্বীনের বিরোধিতা করতে পারে? এমন কি তার এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা ও সম্পর্কহীনতা প্রতিটি অনুষ্ঠানে, বৈঠকে বৃদ্ধি পেতে পারে? এটা হচ্ছে এমন জিহাদ (সংগ্রাম) এগুলো দমন না করা পর্যন্ত শত্রুদের বিবুদ্ধে জিহাদে সফলতা আসবে না। আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার প্রসার ও প্রকাশের আলোচনা শুবু করুন, পাশাপাশি এর বিপরীত জিনিসকে ঘৃণা করুন ও তার অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন এবং এ মহা ফাসাদে পড়ার কারণগুলো নিয়ে ও আল্লাহর বাণী নিয়ে গবেষণা করুন। তাহলেই কেবল তাদের প্রতিহত করা সম্ভব হবে। আল্লাহ সাহায্যকারী। (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড- **১৬১** পৃষ্ঠা)

  কতই মর্যাদাবান তিনি। তাঁর কথাগুলো যেন আমাদের বর্তমান সময়ের জন্যই বলেছিলেন।

- শাঈখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি- হে আমার ভাইয়েরা! আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূলকে আঁকড়ে ধরে রাখুন। তার শুরু, ভিত্তিমূল- "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে ধরে থাকুন। এর অর্থ জানুন ও ভালবাসুন। যারা একে মানে তাদের ভালবাসুন, তাদেরকে ভাই করে নিন। যদিও তারা বংশীয় দিক দিয়ে দূরের হয়। ত্বগুতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করুন। তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করুন। আর ত্বগুতকে যারা ভালবাসে তাদেরকে ঘৃণা করুন। অথবা তাদের বিপক্ষে বিতর্ক করুন। যারা তাদেরকে কাফির ঘোষণা করল না। অথবা বলল, তাদের ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই। অথবা বলল, আমাকে আল্লাহ তাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাননি। তাহলে সে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করল এবং স্পষ্ট পাপ করল। আল্লাহ কাফিরদের ঘৃণা করার জন্য প্রতিটি মুসলিমকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাদের সাথে শত্রুতা, কুফরী ও সম্পর্ক ছিন্ন করা ফরজ করেছেন। যদিও তারা তাদের পিতা, ছেলে বা ভাই হোক না কেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি আপনারা এগুলোকে আঁকড়ে ধরুন। তাহলে আশা করা যায় কিয়ামতের দিন শিরক না করে আপনাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করবেন।

- **সাবধানবাণী ঃ**

এসব কিছুর পর জেনে রাখুন। মিল্লাতে ইব্‌রাহীম প্রতিষ্ঠা করা ও দ্বীনের উপকারে বা স্বার্থে ভাল কাজে গোপনীয় ও লুকানো দাওয়াত পদ্ধতি গ্রহণ করার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নয়। আমাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক। কেননা নবী (সঃ) জীবনে অগণিতবার এ পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। যার অনেক প্রমাণ আছে। তবে এ সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, এ গোপন পদ্ধতি সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে। সেটি হচ্ছে, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির খবর গোপন করা। আর মিল্লাতে ইব্‌রাহীম ও তাদের ত্বগুতী পদ্ধতি ও বাতিল উপাস্যর সঙ্গে কুফরী করাটা এ গোপন পদ্ধতির আওতা ভুক্ত নয়। বরং দাওয়াত প্রকাশ্যে দিতে হবে তা প্রথমেই ঘোষণা করবে যা পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এরই বাস্তব রূপ বলা যায়, নবী (সঃ)-এর হাদীসটি- আমার উম্মাতের একটি দল সদা-সর্বদা প্রকাশ্য হকের উপর থাকবে (মুসলিম ও অন্যান্য) আর এ দাওয়াত গোপনে বা লুকিয়ে দেওয়ার অর্থই হলো ত্বগুতের সাথে আপোষে ভাব, তাদের দলে ঢুকে পড়া, তাদের অবস্থানকে আরো উঁচু করা। এটা কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পদ্ধতি নয়। বরং এটি দুনিয়ার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বভাব ও পদ্ধতি, যাদের বলা ওয়াজিব ঃ

তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য প্রযোজ্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য। (আল-কাফিরূন ১০৯ঃ ৬)

বিষয়টির সারকথা হলো, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গোপনে গ্রহণ করা আর দাওয়াত ও তাবলীগ প্রকাশ্যে।

- এ কথা আমরা এ জন্য বললাম, মানুষের মধ্যে অনেকেই আছে যারা মিথ্যা গুজব রটনা করে বা নবীদের দাওয়াত পদ্ধতি ভাল মত বুঝে না। নিজেদের মূর্খতা বশতঃ বলে, তোমরা আমাদেরকে যে পদ্ধতির দিকে ডাকতেছ আমাদের নিকট খোলাখুলিভাবে তার পরিকল্পনাও বলো, তাড়াতাড়ি দাওয়াত দাও এবং ফলাফল সম্পর্কেও অবহিত কর ইত্যাদি।

প্রথমে তাদের বলা হবে, যে ফলাফলের কথা বলা হচ্ছে সেটি যদি নবী (সঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী না হয় তাহলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না। আধুনিক যুগের দাওয়াত পদ্ধতিই এর বড় প্রমাণ আর এর সাক্ষ্য হলো মিলাতে ইব্‌রাহীমের শরয়ী দলিলগুলো ও নবী রাসূলগণের দাওয়াতী পদ্ধতি। আমরা যদি আজ মুসলিম সন্তানদের মূর্খতা ও হকের সাথে বাতিলের মিশ্রণের অবস্থা দেখি তাহলে অবাক হয়ে যাই। এর কারণ হলো, এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকা। এটা হয়েছে বর্তমান আলেম ও দা'য়ীদের সত্যগুলো গোপন করার জন্যই। যদি তারা স্পষ্টভাবে বলতেন, প্রচার করতেন তাহলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হতেন যেমন নবীদের অবস্থা হয়েছিল। আপনি এর দ্বারা হক্বপন্থী ও বাতিলপন্থী নির্ণয় করতে পারবেন। যদি পারেন তাহলে আপনি রিসালাত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তা বুঝা যাবে। বিশেষ করে বর্তমান যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক সংশয় দূর হয়ে যাবে। যেমন বলা হয়েছে, "আলেম যখন কথা বলে তখন সত্য গোপন করে। আবার যখন মূর্খরা কথা বলে না জেনে না বুঝে তাহলে সত্য কিভাবে প্রকাশ পাবে?" আল্লাহর দ্বীন ও তাওহীদে আমালী ও ইতেকাদী যদি প্রকাশ না পায় তাহলে জনগণ কি আমল করবে? তাহলে দা'য়ীরা কোন ফলাফলের আশায় অপেক্ষা করতেছে?

সেটা কি (ইসলামী রাষ্ট্র)? আল্লাহর একাত্ববাদ মানুষের কাছে প্রকাশ করা; এটাও তাদের শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। আর তখনই সম্ভব যখন আমরা দাওয়াতের কষ্ট স্বীকার করব ও আমাদের দা'য়ীরা পরীক্ষা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হবে। প্রতিরোধ ও বিপদাপদ না হলে কি আর দ্বীন প্রকাশ ও বিজয় লাভ করতে পারে?

আল্লাহ যদি কতক লোক দ্বারা কতককে দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীর ভারসামান্য নষ্ট হয়ে যেত। (আল-বাকারা ২ঃ ২৫)

এ জন্যই দ্বীনের প্রচার প্রকাশ্যভাবে করা ও বিভিন্নভাবে মানুষকে শিরক থেকে বের করে মুক্তি দেওয়া। আর এ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই দা'য়ীরা কষ্ট সহ্য করেন ও কুরবানী দেন এবং ইসলামী রাষ্ট কায়েম করার অনেক মাধ্যমের মধ্যে এটি হচ্ছে একটি বড় মাধ্যম। জ্ঞানী লোকদের জন্য আসাহাবে উখদুদের ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ঐ সত্যের দা'য়ী বালক কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং কোন প্রভাব ও আক্রমণের ব্যবস্থা করেনি। তবুও যখন তার নিকট তাওহীদ প্রকাশ পেয়েছে সে নিজে অপরের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করেছে। দ্বীনে হকের সাহায্য করেছে এবং শাহাদাত লাভ করেছে। এরপর জীবনের আর কি মূল্য থাকতে পারে? যদি হত্যা, জ্বালানো, শাস্তির কোন পরোয়া না করে দাওয়াত দেয় আর দা'য়ী বিরাট সাফল্য লাভ করে। যদি রাষ্ট্র থাক অথবা না থাক। যদি মু'মিনদেরকে জ্বালিয়ে দিতে চায় বা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তাহলে তারা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কেননা আল্লাহর বাণী বিজয়ী ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এর সাথে যোগ করুন, শাহাদাত হলো তাদের পথ আর জান্নাত হলো তাদের গন্তব্যস্থল। আল্লাহ এ নিয়ামত গ্রহণ করার সুযোগ দিন।

- আর এর দ্বারা আপনি জেনে নিন ঐ সমস্ত মূর্খদের কথাঃ "নিশ্চয় এ পথ দাওয়াতকে ধ্বংস করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে।" এ ধরনের কথা বলা মূর্খতা ও গুজব ছড়ানো বৈ কি! কেননা এ দাওয়াত হচ্ছে সেই দ্বীনের দাওয়াত যাকে আল্লাহ সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদিও এটা মুশরিকরা অপছন্দ করে এবং এটা তারা করবেই কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর দ্বীনের সহযোগিতা ও তাকে উর্ধ্বে তোলার সাথে এ ধরনের গুজব রটনাকারীদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা মরলে তাদের নীতিই মরবে। তারা ধ্বংস হলে তাদের রটনাও ধ্বংস হবে অথবা তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ আরেক দল লোক সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

যদি তোমরা দ্বীন গ্রহণ না কর তাহলে তোমাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য জাতিকে এ সুযোগ দিবেন যারা তোমাদের মত হবে না। (মুহাম্মাদ ৪৭ঃ ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে যে দ্বীনকে পরিত্যাগ করবে অতিসত্ত্বর আল্লাহ অপর এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালবাসবেন ও তারাও তাকে ভালবাসবে। মু'মিনদের কাছে নিম্ন ও কাফেরদের কাছে সম্মানিত আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে। এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করেন আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী ও জ্ঞানী। (আল-মায়িদাহ্ ৫ঃ ৫৪)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

যে ব্যক্তি দ্বীন গ্রহণে অস্বীকার করবে, (তবে) নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার পাত্র। (হাদীদ ৫৭ঃ ২৪)

এ হচ্ছে রাসূল ও নবীদের এবং তাদের অনুসারীদের দাওয়াত, যা বর্তমান যুগে আমাদের সময়ে উজ্জ্বল সাক্ষী। তারা সকল মানুষের মধ্যে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সেগুলো তাদের দাওয়াতী কাজে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং সে অন্যায় অত্যাচার আরো বেশী প্রকাশ ও প্রসার লাভে সহায়ক হয়েছে এবং মানুষের অন্তরে ও দলের মধ্যে সে দাওয়াতকে প্রবেশ করিয়েছে। আর অবস্থা আজও চলে আসছে এ নূরের দ্বারাই সমগ্র দা'য়ীরা মানুষকে পথ দেখায়। এটাই হচ্ছে হক্ব (সত্য), যাতে কোন সংশয় নেই।

- এ সত্ত্বেও এখানে আমাদেরকে শেষ সমাধান জানা দরকার। তা হলো, বিরোধী কাফেরদের সাথে শত্রুতা ও সম্পর্ক হীনতার প্রকাশ্য ঘোষণা ও তাদের বাতিল উপাস্যের সাথে কুফরী শুরু করতে হবে প্রত্যেক যুগেই, যদি সে প্রকৃত মুসলিমদের আহবানকারী হয়। এ হচ্ছে নবীদের গুণাগুণ ও সঠিক স্পষ্ট দ্বীনের দাওয়াত ও পদ্ধতি। এ দাওয়াত কখনো সফল হবে না, এর উদ্দেশ্যও ভাল হবে না, আল্লাহর দ্বীন কখনো প্রকাশ পাবে না আর মানুষও সত্যকে জানতে পারবে না যদি তারা এসকল নিয়মের অনুসরণ না করে। এ সত্ত্বেও বলতে হয়, এগুলো যখন একদল সত্যপন্থী প্রচার করে, পরবর্তীতে দুর্বল লোকদের দ্বারা তা সাধারণত বিলুপ্ত হয়ে যায়। উহাই হচ্ছে তোমাদের প্রচার ও প্রকাশ। অতএব যদি এটা নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে হয় তাহলে তা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব প্রত্যেক সময় ও স্থানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা না মানলে কারও ঈমান ও ইসলাম বিশুদ্ধ হয় না। বরং আজকের যুগের এসব দা'য়ীদের মধ্যে এমন লোক ঢুকে পড়েছে যারা নবী (সঃ)-এর পদ্ধতি ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতি, তাদের বাজে তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ), দুনিয়ার বিভিন্ন দলের কিস্‌সা-কাহিনী ও তাদের নিজস্ব পদ্ধতি যেগুলোকে সব সময় গোপন ধর্মীয় কৌলিন বলে মনে করা হয়-সেগুলোর দিকে আহ্বান করে। তারা চাটুকারিতা ও মুনাফেকী করতে দ্বিধাবোধ করে না।

- আমাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা প্রবৃত্তি ও বিবেকের কৌশল দ্বারা উদ্ভাসিত হয়নি বরং বহু শরয়ী দলীল প্রমাণ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছে। নবী (সঃ) এর দুর্বলতার যুগ নিয়ে যে চিন্তা গবেষণা করবে তার কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট ফুটে উঠবে, সেজন্য উপমার দিকে দেখুন বিস্তারিতভাবে সংক্ষিপ্তাকারে নয়। আমর বিন আবাসা আস-সুলামীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, যা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত প্রামাণ্য অংশ হচ্ছে তার কথা, 'আমি আপনার অনুসরণ করব'। তিনি বললেন ঃ '*তুমি আজকের দিনে তা করতে সক্ষম হবে না। তুমি কি আমার অবস্থা ও মানুষের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না। তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও। যখন তুমি শুনতে পাবে যে আমি আত্ম প্রকাশ করেছি তখন তুমি আমার কাছে এসো।*'

  ইমাম নববী বলেছেনঃ "এর অর্থ হচ্ছে আমি তাকে বললাম, আমি তোমার আনুগত্য করব এখানে ইসলাম প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য। আমিও আপনার সাথে অবস্থান করব। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি একাজ করতে পারবে না। মুসলমানদের দুর্বল দুরবস্থার কারণে আমরা কুরাইশ কাফেরদের দ্বারা তুমি অত্যাচারিত হওয়ার ভয় পাচ্ছি। তবে তুমি এ ইসলাম গ্রহণ করার সওয়াব ও অন্যান্য কাজের সওয়াব পাবে। ইসলামের উপর অটল থাক। তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও। নিজের জায়গাতে ইসলাম প্রচার কর। যতক্ষণ না তুমি আমার সম্পর্কে না জানতে পারবে যে আমি শক্তিশালীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছি। তিনিই হচ্ছেন একক ব্যক্তি যাকে নবী (সঃ) দ্বীন গ্রহণের কথা ঘোষণা ও প্রকাশ করতে না করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা সে সময় নবী (সঃ) এর দাওয়াত ছিল প্রসিদ্ধ পরিচিত একটি ব্যাপার হাদীসে তাঁর কথা দ্বারাই পাওয়া যায় ঃ "*তুমি কি আমার ও মানুষের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না?*" (আমি দাওয়াত দিচ্ছি তারা কবুল করতে চাচ্ছে না বরং বিরোধিতা করতেছে।)

এবং বুখারীতে বর্ণিত আবু যার আল-গিফারীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ঃ সে ঘটনায় প্রামাণ্য অংশ হচ্ছে তাকে বলা রাসূলের কথা ঃ "হে আবু যার! আমাদের শক্তি সামর্থ যখন প্রকাশ পাবে তখন আবার এসো..... হাদীস। একথা বলা সত্ত্বেও আবু যার কাফেরদের মাঝে প্রচার করেছেন যে, তিনি মুহাম্মদ (সঃ) এর পথ অনুসারী এজন্য তারা তাকে মারধর করে মরণাপন্ন করে ফেলে যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এসত্ত্বেও তিনি বার বার একথাই প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু নবী (সঃ) তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেননি। তাকে তিরস্কারও করেননি। বর্তমান যুগের দা'য়ীরা যে রকম বলে থাকেন তোমার দাওয়াতী কাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্ঠি হবে। সেরকম কিছু বলেননি। তুমি দাওয়াতের স্বার্থকতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছো অথবা তুমি দাওয়াতী কাজকে এক বছর পিছিয়ে দিলে আল্লাহ তাঁকে এ ধরনের কথা বলা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটা হচ্ছে সমগ্র মানুষের জন্য আদর্শ এবং দাওয়াতী কাজের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় পদ্ধতি। অতএব দুর্বল মুসলমানদের দাওয়াত কবুলের কথা গোপন করা এক জিনিস এবং দ্বীনকে প্রকাশ ও প্রচার করা অন্য জিনিস। আর নবী (সঃ) এর দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক লোকই জানত এর মূলনীতি ও কেন্দ্রীয় মূল কাজ হলো ঐ যুগের ত্বগুতকে অস্বীকার করা। এবার একমাত্র আল্লাহর জন্যই সকল প্রকার ও দিক দিয়ে ইবাদাতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য কাফেররা একে এড়িয়ে ও ভয় করে চলতো এবং বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ করত। তবুও তাঁর দুর্বল অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন বা হিজরত করার চিন্তা করেন যদিও তারা কাফের হতে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন দাওয়াত কবুলকে প্রকাশ্য ঘোষণা করারও তার মূলনীতি প্রসার করার জন্য। যদি তাদের মধ্যে চাটুকারিতা ও আপোষ করার মনমানসিকতা থাকত যেমনটি বর্তমান যুগের দা'য়ীদের মধ্যে আছে তাহলে তারা এ কাজে পুরোপুরি সফল হতে পারতেন না।

- এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আপনি জ্ঞাত হওয়ার কারণে আপনার কাছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যাবে। সেটি হলো, কাফেরদের ধোঁকা দেওয়া বৈধ এবং মুসলমানদের দলের কতক সংখ্যক লোক লুকিয়ে রাখা, প্রতিরোধ ও যুদ্ধের সময় যখন দ্বীন ও দ্বীনের মূলনীতি বিকাশ লাভ করবে তখন তাদেরকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা জায়েয। এ ধরনের অবস্থায় কাব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও এরূপ অন্যান্য ঘটনা প্রমাণ হিসাবে আনা যায়। আর অনেক দা'য়ী আছেন যারা তাদের জীবনকে ত্বগুতের সৈন্য হিসেবে ব্যয় করে যাচ্ছেন। তাদের বন্ধু হয়ে, চাটুকারিতা করে, জীবিত থাকে ও মারা যায়। তাদের সেবা ও তাদের জঘন্য প্রতিষ্ঠানের খেদমাত করে তারাই আবার দা'য়ী, দ্বীনের সাহায্যকারী সাজেন। তারা মানুষের কাছে দ্বীনের স্বরূপকে তালগোল পাকিয়ে দেয় এবং তাওহীদকে কবর দেয়। এ পরিস্থিতি পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান আর নবী (সঃ)-এর দাওয়াত ও হিদায়াত পদ্ধতি পূর্বাঞ্চলে কিছুটা আজও বিদ্যমান আছে।

এটি (সঠিক পথ) পূর্বাভিমুখী আর তুমি পশ্চিমাভিমুখী

আর পূর্বাভিমুখী আর পশ্চিমাভিমুখীর মাঝে কতই না পার্থক্য বিদ্যমান।

আর মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে বিশুদ্ধ দাওয়াতী পথ, যা প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও দাসত্ব জীবনের অবসান। এছাড়া যত পক্ষ, বাঁকা পদ্ধতি, বক্র পথ অনুসরণকারী যারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন্দ্রীয় কোন শক্তি ছাড়াই এবং সুলতানদের আমলাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করেই অথবা এ কাজ করে অণালিকা, নারী, পরিবার ও বাড়ী ও দেশে সুখ সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করতে না পারার কারণে।

মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদিও এর আহ্বানকারীরা দাবী করেন যে, তারা আজ পূর্বসূরীদের নীতির উপর ও নবী রাসূলগণের নীতির উপর আজও প্রতিষ্ঠিত আছেন। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে দেখেছি মুনাফিক ও যালিমদের সাথে কি হাস্যজ্জ্বোলভাবে কথোপোকথন করতে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী কাফিরদের সাথে এরূপ আচরণ করছে অথচ এর দ্বারা তাদেরকে হিদায়াত করার কোন উদ্দেশ্য তাদের মাঝে নেই বরং আছে চাটুকারিতা, তাদের বাতিলের স্বীকৃতি, তাদের জন্য করতালি দেওয়া ও সম্মানের জন্য দাঁড়ানো ও বিভিন্ন উপাধি দিয়ে তাদের সম্মান করা। যেমন বলে, সম্মানের অধিকারী.... । সম্মানিত বাদশাহ..... মু'মিনদের সরদার, উচ্চমর্যাদার অধিকারী, এমনকি আমিরুল মুমিনীন! অথচ তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর দুশমন।[১৮]

---

[১৮] **গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা, যা সরকারী আলেমদের আসল রূপ উন্মোচন করে দেয় ঃ**

জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে এ কাজ করা থেকে রক্ষা করুন। যা অনেক মুর্খরা করে থাকে। যদি তারা শাঈখ উপাধি ধারণ করে এবং নিজেদের সালাফিয়াতের অনুসারী বলে দাবী করে এবং বর্তমান যুগের অনেক ত্বগুত আমিরুল মুমিনীন ও ইমামুল মুসলিমীন উপধি গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তারা খারেজী ও মু'তাযিলাদের পথ অনুসরণ করে থাকে ইমামতিতে কুরাইশি হওয়ার শর্তকে অগ্রাহ্য করে। এজন্য দেখুন সহীহুল বুখারী, আহকাম অধ্যায় (পরিচ্ছেদ ঃ আমীর হবে কুরাইশ হতে) ও অন্যান্য ফিকহ, সুনান, আহকামে সুলতানিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ দেখুন। এটি এমন একটি বিষয় যা পড়তে তেমন পরিশ্রম হবে না। ফাতহুল বারীতে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী কাজী আয়াজ থেকে বর্ণনা করেছেন সমগ্র মাযহাবী আলেমদের ঐক্যমতে মুসলমানদের নেতা হওয়ার জন্য কুরাইশি হওয়া শর্ত। তিনি একে ইজমা বলে গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে পূর্বসুরীদের থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি। পরে তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে খারেজী ও মু'তাযিলাদের মতামতের কোন মূল্য নেই।

অতঃপর শাঈখ আব্দুল্লাহ আবু বাতীনকে "তিনি নজদের একজন দা'য়ী আলেম" দেখেছি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ও আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সাউদ (রহঃ)-কে কুরাইশী না হওয়ার কারণে যারা ইমাম উপাধি দেন তাদের প্রতিবাদ করতে। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) তার জীবনে তিনি মুসলিম উম্মাতের ইমাম বলে দাবী করেননি। বরং তিনি একজন আলিম ছিলেন মানুষকে সঠিক পথের দিকে ডেকেছেন, এ জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছেন, তবে জীবনেও তিনি ইমাম বলে দাবী করেননি। আর আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সাউদ, তারা উভয়ে জীবদ্দশায় ইমাম বলে অভিহিত হতেন না। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরে লোকজন এ ধরনের উপাধি দিচ্ছে। (দেখুন আদ-দারুর আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

এই আলেমে রব্বানীর দিকে তাকিয়ে দেখুন কিভাবে তিনি এসব এড়িয়ে চলতেন। যে সমস্ত হিদায়াতকারী দা'য়ী সে ধরনের উপাধি গ্রহণ করে তারা লাঞ্ছিত হোক। বর্তমানে সরকারী শাঈখদের মত যারা ত্বগুতদেরকে ইমাম বা আমীরুল মু'মিনীন এর উপাধি নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেন তারা সেরূপ করতেন না। তাদেকে তারা সুসংবাদ দিয়েছেন যে তারা খারেজী পন্থীদের মত। তাদেরকে এ (খারেজী) উপাধি যতদূর সম্ভব হক্কানী আলেমদের ছাত্র ও সত্যের আহ্বানকারীরা দিয়েছেন, যারা তাদের ত্বগুতকে বর্জন করে চলেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা প্রমাণ করে নেতা (ইমাম) হবেন কুরাইশ বংশ থেকে। যদি এর সাথে ইনসাফ, জ্ঞান ও হিকমাত না থাকে সেগুলো ইমাম হওয়ার জন্য শর্ত তাহলে সে কিভাবে ইমাম হতে পারে? আবার যদি তার মধ্যে ইসলাম ও ঈমান না থাকে তাহলেই বা কিভাবে সে ইমাম হতে পারো? কিভাবে, কিভাবে?

আল্লাহর কসম! আমরা তাদের দেখেছি। তারা মশার ডানার চাইতেও সস্তা মুল্যে দ্বীনকে বিক্রি করে দেয় অথচ তাদেরকে মু'মিন বলা হয় এবং তারা তাওহীদের পাঠও দেন। সময় সময় তারা কুফরী আইনে রচিত সংবিধানকে সম্মানে শপথ করতেও আরম্ভ করেন এবং তৈরী করা আইনের পবিত্রতার সাক্ষী দেন অত্যাচারীদের দল ভারি করে এবং তাদের সাথে সাক্ষাতে হাস্যোজ্জ্বল মিষ্টি কথা বলেন অথচ তারা দিন রাত আল্লাহর আয়াত (কুরআন) নিয়ে দৌড় ঝাঁপ করে বেড়ায়। তাদেরকে কি আপনি নসিহত করবেন যালেমদের সাথে না মিশতে, তাদের আনুগত্য ও তাদের বাতিলের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ না করতে তারাই কুরআনের এ আয়াতগুলো পড়ে থাকে যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

যালেম অত্যাচারীদের সংস্পর্শে যাবে না তাহলে তোমাদেরকেও জাহান্নামের শাস্তি গ্রাস করবে ... (হুদ ১১ঃ ১১৩)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

তোমাদেরকে কিতাবে বলা হয়েছে যখন তোমরা শুনতে পাবে কোন ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে অথবা ঠাট্টা করে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে উঠা বসা কর না যতক্ষণ তারা সে ধরনের কথাবার্তা বলতে থাকে। যদি তোমরা সেখানে উপস্থিত থাক, তাহলে তোমরাও তাদের অর্ন্তভুক্ত বলে গণ্য হবে। (আন্-নিসা ৪ঃ ১৪০)

- শাঈখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব বলেন ঃ আল্লাহর বাণী **"তাহলে তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।"** এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি যদি শোনে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার বা ঠাট্টা করা হচ্ছে আর সে কাফেরদের ও অস্বীকারকারীদের সাথে সেটাকে অপছন্দ ও অস্বীকার না করে অথবা সেখান থেকে না উঠে তাহলে সে লোকও তাদের মত কাফির যদিও সে একাজ না করে। (আদ্-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড পৃষ্টা-৭৯)

আল্লাহর বাণী ঃ

যখন তুমি কাউকে আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে শুনবে তুমি তাদের হতে চলে আস । যতক্ষণ তারা এ ধরনের আলাপ করে ততক্ষণ তাদের থেকে দূরে থাক।
(আল-আন্আম ৬ঃ ৬৮)

- হাসান বসরী বলেছেন ঃ যারা আয়াত (কুরআন) নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাদের সাথে বসা বৈধ নয়। আল্লাহর এ বাণীর ভিত্তিতেঃ **যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর যালেমদের সাথে উপবেশন কর না।**[১৯]

  তেমনি আল্লাহ আরো বলেন ঃ **যদি আমি আপনাকে দৃঢ় না রাখতাম তাহলে আপনি কিছুটা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন। যদি ঝুঁকে যেতেন তাহলে জীবন ও মৃত্যুর শাস্তি আপনাকে আস্বাদন করাতাম। তখন আমাদের বিপক্ষে আপনি কোন সাহায্যকারী পাবেন না।** (বানী ইসরাঈল ১৭ঃ ৭৪)

- শাঈখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বলেন ঃ সর্বোত্তম সৃষ্টি নবী (সঃ)-কে যদি এ ধরনের হুমকি দেওয়া হয় তাহলে অন্য মানুষের অবস্থান কোথায় (আদ্ দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা)

  তারা মু'মিনদের গুণাবলীর এ আয়াত পাঠ করে ঃ

  যারা আজে বাজে কথা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। (মু'মিনুন ২৩ঃ ৩)

  এবং আল্লাহর বাণী ঃ

  যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় না। আর যখন তারা আজে বাজে কথার অনুষ্ঠানে থাকে সুকৌশলে সেখান থেকে তারা প্রস্থান করে। (ফুরকান ২৫ঃ ৭২)

এগুলো করা সত্ত্বেও তারা মনে করে তারা সালাফীদের নীতির উপর আছেন। আর সালাফীগণ বাদশাহদের দরবার হতে পলায়ন করতেন শরয়ী অভিভাবকের পদ মর্যাদাও প্রত্যাখান করতেন। তারা তাদের অন্যায় ও অত্যাচারের সাথে হাত মিলাননি। আর আল্লাহর শপথ! তারা তাদের ঘাড়ে তলোয়ার ধরেনি, তাদেরকে পা বেধে উল্টা ঝুলিয়ে রাখাও হয়নি এবং তাদেরকে কোন প্রকার জোর করাও হয়নি। বরং, তাদেরকে প্রচুর ধনসম্পদ এবং কুটনীতিতে সুদৃঢ়তা অর্জনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও চোখের দৃষ্টিহীনতা থেকে বাঁচার প্রার্থনা করছি। আমরা আশা করি যেন তারা অন্তত এটা ঘোষণা করে ঃ 'আমরা কাজ করেছি দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে।' বরং তারা বলেঃ 'দাওয়াতের কৌশল ও দ্বীনের উপকারের জন্য একাজ আমরা করছি।' সুতরাং, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমদের এই উপহাস কাদের জন্য? আমাদের উপর, আমরা দুর্বল লোক? যদি তাই হয়, তবে আমরা ও আমাদের মত লোকেরা কেউই তোমাদের ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। নাকি আকাশের মহা পরাক্রমশালী, আল-জাব্বর-এর উপর যার কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না যিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই জানেন।

---

[১৯] আল-আনআম ৬ঃ ৬৮

আমরা ঐ সরকারী গোলামদের (ও তাদের বেতনভুক্ত আলেমদের) অভিযোগ করতে শুনেছি তাদের বিরুদ্ধে যারা তাদের বিরোধিতা করে অথবা তাদের কাজকে সমর্থন করে না, এই বলে যে, 'তাদের অগভীর গবেষণা ও স্বল্পজ্ঞানের কারণে তারা দাওয়াতী কাজের হিকমাত অবলম্বনকারী নন এবং ফলাফল বেছে নিতে ধৈর্যশীল নন অথবা দুনিয়াবী রীতিনীতির ব্যাপারে অজ্ঞ, তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান কম ও অভিজ্ঞতার অভাব আছে।'

অথচ তারা এটা উপলব্ধি করে না যে, তারা এ ধরনের কথা বলে কেবল গুটিকয়েক লোককে অপমান করে না বরং সমস্ত রাসূলগণের মিল্লাতকে অপমানিত করে, যে ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা, তাদের বক্র পথকে অস্বীকার করা, তাদের কুফরী পদ্ধতিকে ঘৃণা ও প্রত্যাখান করা, অথচ সেক্ষেত্রে তাদের কথাবার্তা দ্বারা মনে হয় যে, ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথীদের দাওয়াতী পদ্ধতিতে কোন হিকমাত ছিল না। অথচ আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করেছেন ও আমাদের অনুকরণ করতে বলেছেন ঃ

ইব্‌রাহীম ও তাঁর সাথীদের মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে... (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

তার চাইতে কে ভাল দ্বীনদার, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং সে মুহসিন (একনিষ্ঠ) ছিলেন মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করেছে আর আল্লাহ ইব্‌রাহীমকে একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু করে নিয়েছেন। (আন-নিসা ৪ঃ ১২৫)

আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আঃ) কে বোকামী হতে পবিত্র ও বুদ্ধিমান বলে গুণান্বিত করেছেন ঃ

আমি ইতোপূর্বে ইব্‌রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছি আর তাঁর সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। (আম্বিয়া ২১ঃ ৫১)

এরপর তিনি ইব্‌রাহীম (আঃ)-র দাওয়াতের প্রশংসা করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, মিল্লাতে ইব্‌রাহীম হতে কেউ মুখ ঘুরায় না তাহলে কি বোকাদেরই দাওয়াতের হিকমাত, স্পষ্ট চিন্তা চেতনা, সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক পথ রয়েছে?

‘অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমে অটল থাকার দুঃসাধ্যতা এবং ভ্রান্ত পথ অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি সতর্কবাণী

জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁর সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের মিত্রতা ও বৈরিতা কাফেরদের সাথে শুরু করা ও তাদের নিকট তা প্রকাশ করা ও তাদের উপাস্য গুলিকে বর্জন করার যে আহবান জানায় তা মানা বড়ই কষ্ট সাধ্য। কেউ যেন মনে না করেন যে, এ পথে গোলাপ ও ফুল বিছিয়ে রাখা আছে অথবা এ কথা মনে না করেন এ পথে সুখ সহনশীলতায় ভরপুর। না, বরং এ পথ দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে ভরপুর। কিন্তু এর ফলাফল হচ্ছে মিসকে আম্বরের ঘ্রাণযুক্ত পানীয়, সুখ শান্তি ও সন্তুষ্টচিত্তে পরকালে রবের সাক্ষাত লাভ আমরা আমাদের ও মুসলমানদের জন্য কোন বালা-মুসিবত কামনা করি না। তবে আল্লাহ তা'আলার রীতি মোতাবেক এ পথে বিপদাপদ আছেই। এর দ্বারা যেন মন্দ হতে ভালকে বাছাই করতে পারেন। সেটা এমন পথ যার উপর প্রবৃত্তির অনুসারী ও বাদশাহরা খুশি হতে পারে না। কেননা, এ হলো তাদের কার্যকলাপের স্পষ্ট প্রতিবন্ধক, এবং তাদের উপাস্য ও শিরক হতে স্পষ্ট বৈরিতা।

আর এপথ ছাড়া অন্য পথের অনুসারীদের দেখবেন অধিকাংশ সুখী, বিলাসী ও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। তাদের মধ্যে বালা-মুসিবতের কোন লেশমাত্র নেই। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দ্বীন অবলম্বনের সমপরিমান পরীক্ষিত হয়। তাই সবচেয়ে বিপদাপদ সহ্য করেছেন নবীগণ। এরপর নবীদের মত যারা কাজ করেছেন তারা। আর মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসারীরা মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী বালামসিবতে আক্রান্ত। কেননা দাওয়াতী ক্ষেত্রে তারা নবীগণের পদ্ধতির অনুসরণ করে। যেমন ওয়ারাকা বিন নওফিল নবী (সঃ) কে বলেছিলেনঃ “তুমি যা নিয়ে এসেছ তা যেই নিয়ে এসেছিল তারই সাথে শক্রুতা কর হয়েছিল।” (বুখারী)

আমাদের বর্তমানে যাকে বলতে দেখবেন যে, ঐ ব্যক্তি নবী (সঃ) যেভাবে দাওয়াত দিতেন সেভাবে দাওয়াত দেন ও তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী চলেন এবং দাবী করেন তিনি নবী (সঃ) এর পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। অথচ বাতিলপন্থী ও বাদশাহদের অনৈসলামী কাজের বিরোধিতা করেন না, তিনি দুপক্ষকে খুশি করেই সন্তুষ্ট। তাহলে তার অবস্থার দিকে তাকান, হয়তো সে ইসলামী তরীকা হতে পথভ্রষ্ট। নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তিনি তা নিয়ে আসেননি বরং তিনি বক্র পথের অনুসরণ করেছেন অথবা তার দাবীতে সে মিথ্যাবাদী। সে এমনরূপ ধারণ করেছে সে রূপ ধারণ করার যোগ্য সে নয়। হয়তো প্রবৃত্তির অনুসারী অথবা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে দ্বীনাদার লোকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ও তদন্তকারী হিসাবে বাদশাহদের কাজ করছে এ কথাই ওয়ারাকা বিন নওফিল নবী (সঃ) কে বলেছিলেন, যা সাহাবীদের অন্তরে বায়আতের সময় পূর্ণ মাত্রায় ছিল। যেমন আসতাছ বিন যুরারা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ হে মদীনাবাসী! তোমাদেরকে মতামত গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছি। তাকে বের করে নেওয়া মানে সমগ্র আরবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অথবা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষ করা যার তলোয়ার তোমাদের কাটবে। তোমরা যদি এর উপর ধৈর্য ধারণ করতে পার তাহলে এর বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে নিও। আর যদি তোমরা এমন ব্যক্তি হও যারা নিজেরাই ভয় করে তাহলে তাকে রেখে যাও। তাহলে এটাই আল্লাহর কাছে ওজর হিসাবে বলতে পারবে। (আহমাদ ও বায়হাকী)

এ ব্যাপারটি ভালভাবে চিন্তা করুন, যা আমাদের আজকের দ্বীনে বড় প্রয়োজন যে সময় ভণ্ডরা দা'য়ীদের বেশে দাওয়াতী লেবাসে দৌড় ঝাপ করে বেড়ায়। নিজের দিকে ফিরে তাকান ও নিজেকে পরিমাপ করুন কতটুকু হকের উপর আছেন। ইসলামী ও অন্যান্য পথগুলিকে নিজের সামনে তুলে ধরে হিসাব করুন, আপনি কতটুকু কোন পথে আছেন। যদি আপনি ধৈর্যধারীদের অর্ন্তভুক্ত হন তাহলে তা ভালভাবে আকড়ে ধরুন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, যেন এর পিছনে যে বালা-মুসিবত আসবে তাতে যেন টিকে থাকতে পারেন।

আর যদি আপনি সেই ধরনের লোক হন যারা নিজের জীবনকে খুব মায়া করেন এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখেন ও এ মিল্লাত প্রচার করার সাহস পান না। তাহলে আপনি দা'য়ীর লেবাস খুলে ফেলুন, ঘরে তালা লাগিয়ে বসে থাকুন। শুধু আপনার ব্যক্তিগত কাজ করুন সর্বসাধারণের কাজ করা ছেড়ে দিন অথবা আপনার বকরীর পাল নিয়ে পাহাড়ের কোন গুহায় আশ্রয় নিন।

আল্লাহর শপথ! এ হচ্ছে আসয়াদ বিন যুরারা যা বলেছেন তার বাস্তবরূপ। তিনি বলেছেন, এটা হবে তোমার জন্য আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত। হ্যাঁ, ইহা আপনার জন্য কৈফিয়ত বটে, আপনি আপনার নিজেকে ও মানুষদের হাসাতে পারবেন যখন মিল্লাতে ইব্‌রাহীম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন না। যখন বক্র পথে দাওয়াতের জন্য বের হবেন ও মানুষকে নবী (সঃ) প্রদর্শিত পথ বাদে অন্য পথে হিদায়াত করার প্রয়াস চালাবেন। ত্বগুতের সাথে সুন্দর ও নম্রভাবে কথাবার্তা হল, তাদের সাথে শত্রুতাকে গোপন করা এবং তাদের বাতিলকেও অস্বীকার না করা। আল্লাহর শপথ! অতঃপর আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি আপনার চাইতে অনেক উত্তম ও হিদায়াতপ্রাপ্ত, যে তার বকরীর পাল নিয়ে পাহাড়ের গুহায় চলে যায়। হে জাতি! যারা আজকাল আকর্ষণীয় বক্তব্য দেয়, তাদের সে বক্তব্যে প্রভাবিত হইও না। তারা মিম্বারে চড়ে, নোট লিখে তা সকল অনুষ্ঠানে পেশ করে। আল্লাহর শপথ! তারা হক্ব কথা, হিদায়াতের কথা এমনকি মানুষের ধ্বংসের কারণগুলোও বলে না। যেখানে একটু হকের (সত্যের) ইঙ্গিত দেন তিনি অত্যাচারী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের আশায়। অথবা আধুনিক যুগের সম্মান লাভ ও প্রসিদ্ধি অর্জন করার জন্য। হে জাতি ভাই! আমার উপদেশ হচ্ছে, বর্তমানে যে কোন কিছুর প্রতিই ভাল কিছু পুরোপুরি আশা করা ঠিক। আল্লাহর দ্বীন নিয়ে বেঁচে থাকুন সন্দেহ ও সংশয় নিয়ে নয়। আমি তাদেরকে অনেক দেখেছি তারা উপহাস করে। তাদের ভ্রষ্ট ও বক্রপথ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাদের কাছ থেকে তাদের দাওয়াত হতে দূরে থাকুন যে দাওয়াত নবী (সঃ)-এর তরীকার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদেরকে দেখেছি যারা আলাদা থাকে তাদেরকে উপহাস করতে। তারা দুনিয়ায় স্বার্থ হাসিল করার জন্য আমন্ত্রণ করে এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত কম দিতে বলে...।

ব্যাপারটি যখন সেরকম, তাহলে এটা কোন দাওয়াত যাতে তারা শিথিলতা দেখিয়ে তোমাদের এ দাওয়াত দ্বারা সেনাবাহিনী ও পুলিশ লালন-পালন, জাতীয় সংসদ সদস্য বিভিন্ন চাকুরীজীবিকে নিয়োগ দেওয়া হয় বা শুধু অত্যাচারীদের দলভারী করা হয়। অথবা সে আহ্বান দ্বারা সমাজের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিকৃত রুচির স্কুল ও কলেজগুলোতে অসভ্য আড্ডা প্রবেশ করায় এ যুক্তিতে যে, এটা হচ্ছে দাওয়াতী কৌশল তাই দ্বীনের বাস্তবরূপ এখনই প্রকাশ করা যাবে না। অথচ তোমরা দাওয়াত দাও নবী (সঃ)-এর প্রদর্শিত পথ বহির্ভূতভাবে। অথবা তারা হক্বের

দাওয়াতে শিথিলতা করেছে যেরূপ শিথিলতা করেছে অপর দলটিও, আর তারা কেউই মিলাতে ইব্‌রাহীম-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তারা নবী (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে যা ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, "মু'মিন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের সাথে মেলামেশা করেন ও তাদের দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেন সেই মু'মিন নয় যে মানুষের সাথে মিশেনা ও তাদের দুঃখ কষ্টে ভাগী হয় না।"

আমাদের মতামত হলো, এ হাদীস প্রাচ্যের জন্য আর আপনি পাশ্চাত্যের লোক। তাই মানুষের সাথে মেলামেশাও হতে হবে নবী (সঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক। আপনাদের মন ও প্রবৃত্তির ও বিদ'আতী দাওয়াতী পদ্ধতি দ্বারা নয়। যদি নবী (সঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক হয় তাহলে কষ্ট ও সওয়াব এক সাথেই পাওয়া যাবে। আর যে নবীর (সঃ) আদর্শ মোতাবেক দাওয়াত দেয় না সে আবার কিসের সওয়াবের আশা করে? সে তো আমল কবূল হওয়ার শর্তের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্তই ছেড়ে দিয়েছে সেটি হলো (রাসূলের আনুগত্য করা)। যে ব্যক্তি ফাসিক, পাপিষ্ঠ ও বিদ্রোহীদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে না, তাদের শিরকের সাথে ও তাদের বক্রপথের সাথে বৈরিতা প্রকাশ করে না তাহলে তাদেরকে আর কিসের দুঃখ কষ্ট গ্রাস করবে বরং তাদের সাথে উঠা-বসা করে বাতিলকে সমর্থন করে, হাসিমুখে কথা-বার্তা বলে। যখন তারা আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে তখন কড়া চোখে তাকায়ও না বা রাগান্বিত হয় না। দাওয়াতে নম্রতা, হিকমাত ও উত্তম কথা, মানুষকে দ্বীন থেকে বিতাড়ন, দাওয়াতের কৌশল প্রভৃতি যুক্তিতে তারা এ কাজ করে। তারা এভাবেই দ্বীনকে ধ্বংস করে তাদের নম্রতার কুঠার ও বিদ'আতী হিকমাত দ্বারা।

শাঈখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান আদ্ দুরার আস-সানিয়্যাহ পুস্তিকায় দ্বীন প্রচার, সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করা সম্পর্কে বলেন, এটা তারা (কতক মূর্খরা) বর্জন করে চাটুকারিতা ও তাদের সাথে ঘনিষ্টতা রক্ষার জন্য। এ কাজ সবচেয়ে ক্ষতিকারক, সবচেয়ে বড় গুনাহ, যে কেবল মূর্খতা বশতঃ করে এ যুক্তিতে এ পথ মেনে চললে বিলাসী জীবন পাওয়া যাবে না তাই তোমরা রাসূলদের ও তাঁদের অনুসারীদের বিরুদ্ধাচারণ কর এবং তাদের পথ ও মত থেকে ফিরে আস। তারা মনে করে, মানুষকে তাদের শ্রেণী অনুযায়ী খুশি করা, নিরাপদে রাখা ও তাদের ভালবাসা অর্জন করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। আত্মিক প্রশান্তি ও মানুষের সুখ শান্তি আনয়নের কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি আল্লাহর জন্য মানুষের সাথে শত্রুতা পরিত্যাগ করা, এর জন্য কষ্ট স্বীকার না করাই হচ্ছে প্রকৃত ধ্বংসের কারণ। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বৈরিতা ও মিত্রতা করেনি সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। বুদ্ধিমানের কাজ হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন তার সাথে সম্পর্ক করা। আর এগুলো অর্জিত হয় আল্লাহর শত্রুদের সাথে বৈরিতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া দ্বারা এবং যখন কেউ হারামের সীমালঙ্ঘন করবে তখন তার সাথে রাগ করা। আর রাগ সৃষ্টি হয় আত্মার জীবনীশক্তি ও তার ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মমর্যাদা থেকে। যখন আত্মার জীবন আত্মমর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হবে তখন তার মধ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে রাগের সৃষ্টি হবে না। তাদের সাথে লেনদেন, আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল মন্দ সবই বরাবর হয়ে যায়। তাহলে এ ধরনের অন্তরে আর কি ভাল জিনিস অবশিষ্ট আছে? (জিহাদ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৫)

এদের কতককে এমন পাবেন যারা যে তাদের তরুণ অনুসারীদের কর্মকাণ্ড দেখে হাসে। তারা নিরস্ত্রভাবে যুদ্ধ করতে চায় এবং এ বিষয়ে বর্ণিত দলীলকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহঃ)-এর ফুযাইরের নিকট প্রেরিত এক পত্রে যে কবিতা বলেছিলেন, সেটি বলে থাকে ঃ

হে হারামাইনের উপাসক! তোমরা যদি আমাদেরকে দেখতে
তাহলে তোমরা বুঝতে যে তোমরা শুধু ইবাদতের ব্যাপারে ঠাট্টা করছ।
যার গ্রীবা তার অশ্রুতে ভিজে,
তবে আমরা আমাদের দেহ ভিজে রক্তে।

যদি তাদেরকেও তাদের বক্র দাওয়াতী কাজকে হারামাইনের উপাসক (আবেদ) দেখতেন, তাহলে হয়তো বলতেন, প্রশংসা মাত্র সেই আল্লাহর, যিনি তোমরা যে ফিতনায় পতিত হয়েছ তা থেকে আমাকে মুক্ত রেখেছেন এবং অনেকের উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন।

আর আমি বলতাম, তাদের এই দাওয়াত ও তরীকা এবং ইবন মুবারক ও সালেহীনদের যুদ্ধের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, যাতে করে এ নিয়ে সালেহীনদের ইবাদত প্রতিযোগিতা করতে পারে বরং কদাচিত যদি ইবন মুবারক তাদের এ দাওয়াত দেখতেন তাহলে ফুযাইলকে অবশ্যই এ কথা বলে পাঠাতেন,

“হে হারামাইনের আবেদ, যদি তোমাদেরকে দেখতাম তাহলে প্রশংসা করে বলতাম, আপনি ইবাদতে অনুপস্থিত। যে ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর পথ ও মত অনুযায়ী দাওয়াত দেয় না সে তার দ্বীনের ব্যাপারে মূর্খ ও দ্বীন নিয়ে খেলা করে?”

অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্রাহীমে অটল থাকার ব্যাপারে দায়ীত্বসমূহ

হ্যাঁ, মিল্লাতে ইব্রাহীম মেনে চলা অনেক কঠিন। তবে এর সাথে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য ও বড় সাফল্য। এর দ্বারা মানুষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ঈমানের শ্রেণী ও কাফের, ফাসিক ও আল্লাহদ্রোহী শ্রেণী। আর এর দ্বারাই শাইতানের ওলী থেকে আল্লাহর ওলী কারা তা স্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়। এরূপই ছিল নবী-রাসূলদের দাওয়াত। আমরা যে ধরনের রুগ্ন মনোভাব নিয়ে আজ বসবাস করছি তাদের তেমনটি ছিল না। কুচক্রীকে ভদ্রের ও সৎ লোককে খারাপ লোকের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফাসিক কাফেরদের সাথে দাড়িওয়ালাদের নম্র ব্যবহার, উঠাবসা, সম্মান,তাদেরকে আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের উপর প্রাধান্য দেওয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের দ্বীনের বৈপরিত্য ও শত্রুতা প্রকাশ ধুলায়িত হোক বরং তাদের দাওয়াত শারীয়াত বিরোধী সকল শ্রেণীর সাথে স্পষ্ট বৈরীমূলক ও তাদের বাতিল উপাস্যের সহিত প্রকাশ্য শত্রুতা। তারা কোন মধ্যস্ততা, চাটুকারিতা ও নম্রতা দেখাননি দ্বীনের প্রচারে।

- পূর্বের যুগের নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে শুনুন, তিনি তার সম্প্রদায়ের বাদশাহ ও তাদের উপাস্যের কোন পরোয়া না করে একাই হুংকার দিয়ে বলেনঃ

হে আমার জাতি! যদি আমার অবস্থান ও আল্লাহর আয়াত দ্বারা তোমাদেরকে দেওয়া আমার দাওয়াত তোমাদের কাছে অসহ্য ও অসম্ভব মনে হয় তাহলে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি। তাহলে তোমরা তোমাদের কর্মপদ্ধতি ও অংশীদারগণকে একত্রিত কর, এরপর তোমাদের কাজ তোমাদের উপর যেন কঠিন না হয়ে পড়ে। এরপর আমার সাথে ফায়সালা কর এবং আমাকে কোন অব্যাহতি দিও না। (ইউনুস ১০ঃ ৭১)

কোন চাটুকার কি এ কথা তার জাতিকে বলতে পারবে, যেমন সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ) বলেন, উদ্দীপক খোলা চ্যালেঞ্জ, হাতে জনবল না থাকলে যে কথা কেউ বলে না এবং সে তার জন সংখ্যা, তার পূর্ণাঙ্গ আস্থা যাতে নিজেই দ্বন্দ্ব মিটাতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে উদ্দীপনামূলক কথা বলে আক্রমণ করার জন্য উৎসাহ দেয়। তাহলেই কেবল সে ধরনের কথা যদি বলা যায় তাহলে নূহ (আঃ)-এর পিছনে কোন শক্তি ও জনবল ছিল? তাঁর সাথে ছিলেন আল্লাহ। তিনিই পথ পদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে এ আয়াতগুলোকে তার জাতির নিকট তিলাওয়াত করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, **তাদের কাছে নূহ (আঃ)-এর সংবাদ পড়ে শুনান, যখন নূহ (আঃ) তার জাতিকে বললেনঃ ......** । (ইউনূস ১০ঃ ৭১)

- আর হুদ (আঃ)-এর দিকে দেখুন, তিনি এমন এক জাতির মুখোমুখি হয়েছিলেন যারা মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ও নির্দয় ছিল। তাদের তিনি মোকাবেলা করেন একাই। পাহাড়ের মত দৃঢ়ভাবে অথবা এর চাইতে আরো শক্তভাবে। তার দিকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

তিনি তার সম্প্রদায়ের শিরকের সাথে খোলাখুলিভাবে বৈরিতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর চিরন্তন বাণী শুনুন ঃ

.

তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি তোমরাও সাক্ষী থাক। তোমরা আল্লাহ ছাড়া যার সাথে শিরক কর আমি তা হতে মুক্ত। তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যদি ষড়যন্ত্র কর তাহলেও তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (হুদ ১১ঃ ৫৪-৫৫)

তিনি তাদেরকে এ কথা বলেছিলেন যখন তিনি শুধু একাই ছিলেন, "তোমরা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের জনবল ও সৈন্য সামন্ত ও তোমাদের বাতিল প্রভুদের নিয়ে ষড়যন্ত্র বা আক্রমণ কর তবুও আমি আমার আহ্বান থেকে সরে যাব না।"

আর আমার রব সঠিক ও সরল পথের উপর আছেন। (হুদ ১১ঃ ৫৬)

এবং যারা তাদের অনেক কথায় সাইয়্যিদ কুতুবের (রহঃ) উক্তি পেশ করেন, অথচ যখন তারা উদগ্রীব - অথবা আরও নিকৃষ্টকর, যে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে ত্বগুতের কাছে প্রার্থনা করার জন্য, যারা আল্লাহর শরীয়তের বিরোধী, যেন কিছু ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর শরয়ী ফায়সালার বিধান চালু করে অথবা আল্লাহর রাস্তায় যেন তাদের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়; অথবা শিরকী, ফাসেকী ও আল্লাহদ্রোহী প্রতিষ্ঠানে একটি ভাল পোস্টে চাকুরি পায়। এ ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে সাইয়্যিদ কুতুবের (রহঃ) এসকল আয়াত প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন তিনি বলেন, এটি হচ্ছে জাতি থেকে দায়মুক্তির আন্দোলন তাদের অনেকের এবং তাদের ভাইদের অবস্থা ছিল এমন যে, তাদের মধ্যে বসবাস করলে ভয়ের মধ্যে থাকতে হতো সেজন্য তারা আল্লাহর পথ বাদে অন্য পথ ধরেছে এবং দুই দলের মধ্যে এমন বিচ্ছেদের আন্দোলন ঘটেছে যে, তারা আর মুখোমুখি হয় না, তারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্টজাতি হতে মুক্ত করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে আলাদা করেছেন। তারা তাদের সামনেই এই দায়মুক্তির কথা বলে থাকে যাতে তাদের অন্তরে কোন সন্দেহ, ঘৃণা ও ভয় না থাকে, যা থাকার কথা।

নিশ্চয় মানুষ ঐ লোককে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যায় যে এ সকল জাতির মোকাবেলা করে যারা তাদের বানোয়াট প্রভুদের উপর চরম আস্থাশীল ও বিশ্বাসী। সে তাদের প্রভুদেরকে নির্বোধ ও তাদের আকীদা ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। তাদেরকে দাওয়াত কবুলের প্রস্তুতি গ্রহণের কোন সুযোগ দেয় না এবং তাদের রাগ প্রশমিত হওয়ার জন্য বিলম্ব করে না। নিশ্চয় আল্লাহর দিকের আহ্বায়করা প্রত্যেক স্থান ও কালে প্রয়োজনে এ ধরনের চমৎকার পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন।

একজন মাত্র লোক, তার সাথে গুটি কয়েকজন লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি। পৃথিবীর সবচেয়ে ঔদ্ধত্য, সম্পদশালী ও তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বেশী সাংস্কৃতিবান ও জড়বাদীদের মোকাবেলা করেছেন। যারা ছিল কঠোর ও নিষ্ঠুর, যারা নির্দয়ভাবে জুলুম করত। যাদেরকে নেয়ামত অহংকারী করে তুলেছিল। যারা তাদের জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টরী বা শিল্পকারখানা তৈরী করেছিল দীর্ঘজীবি ও চিরস্থায়ী হওয়ার আশায়। এটাই হচ্ছে ঈমান, বিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তি। আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রাখা, তাঁর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা ঃ

আমি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীরই কেশগুচ্ছ তিনি ধরে রেখেছেন, নিশ্চয় আমার রব সঠিক পথেই আছেন। (হুদ ১১ঃ ৫৬)

তাঁর জাতির এই নিষ্ঠুর ও শক্ত হৃদয়ের লোকজনও পৃথিবীর বিচরণশীল প্রাণী, আল্লাহ তাদেরও কেশগুচ্ছ ধরে রেখেছেন এবং তাঁর শক্তি দিয়ে তাদের উপর তাঁর কঠোরতা প্রকাশ করবেন। তাহলে এ প্রাণীগুলোকে কিসের ভয়? এদেরকে নিয়ে কিসের আনুষ্ঠানিকতা? এগুলো তার উপর চড়াও হবে না যদি চড়াও হয় তবে কি তার রবের অনুমোতি ক্রমেই হবে? (সংক্ষিপ্ত আয-যিলাল)

এরূপই ছিল রাসূলদের (সঃ) অবস্থা তাদের বিরোধী জাতির সাথে। আর তাদের দাওয়াতও ছিল সারাক্ষণ বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, দাওয়াতকে স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা, শত্রুতা ও বৈরিতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দেয়া, তাদের দাওয়াতে কোন চাটুকারিতা, তাদের বলার আংশিককে সমর্থন অথবা রাস্তায় সাক্ষাতের সময় ভাল ব্যবহার করেছেন এরূপ কোন কিছু জানা যায় না।

বাতিল ও বাতিলপন্থীদের সাথে দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা বহু পুরাতন সমাধান। আদম (আঃ)-কে দুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়ার সময় হতেই আল্লাহ এ কাজ ফরজ করেছেন। আল্লাহ এটা মানুষের কাছ থেকে আদায় করতে চেয়েছেন তাকদীর ও শরীয়তের মাধ্যমে যাতে করে তাঁর শত্রুকে আর বন্ধুকে ও শয়তানের দল থেকে তাঁর দল, মন্দ থেকে ভালকে বাছাই করতে পারেন এবং মু'মিনদের মধ্যে থেকে সাক্ষী গ্রহণ করতে পারেন। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

তোমরা নেমে যাও, তবে তোমরা একে অপরের শত্রু। (আল-আরাফ ৭ঃ ২৪)

এ নীতির উপরই রয়েছেন, রাসূলদের সমগ্র কাফেলা আর এটিই ছিল তাদের দ্বীন, যা ইতোপূর্বে পাঠকগণ অবগত হয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

এমনিভাবে প্রত্যেক নবীদের পিছনে মানুষ ও জীনদের হতে শয়তান নিয়োগ করেছি।
(আল-আন্‌আমঃ ১১২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের থেকে শত্রু করেছি । (ফুরকান ২৫ঃ ৩১)

. . .

. . .

আপনি বলে দিনঃ হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর । এবং তোমরা তাঁর ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি । এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর । এবং তোমরা তাঁর ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি । তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমাদের দ্বীন (ইসলাম) আমাদের জন্য । (আল-কাফিরূন ১০৯ঃ ১-৬)

হে মানুষেরা! তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ কর তাহলে জেনে রাখ আল্লাহ বড় । এক আল্লাহর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে মৃত্যুদেন । আমাকে মু'মিন হওয়ার আদশে করা হয়েছে । (ইউনূস ১০ঃ ১০৪)

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ

যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে বলুন, তোমাদের কাজ তোমরা কর আমার কাজ আমি করি । তোমরা যা কর আমি তা থেকে মুক্ত আবার আমি যা করি তোমরা তা থেকে মুক্ত । (ইউনূস ১০ঃ ৪১)

আল্লাহ মু'মিনদের বলার জন্য শিখিয়ে দিয়ে বলেন,

আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের রব । আমাদের কাজ আমরা করব, তোমাদের কাজ তোমরা কর । (আশ্-শুরা ৪২ঃ ১৫)

আবূ দাঊদ ও অন্যান্যদের বর্ণিত সহীহ্ হাদীসে এসেছে- নিশ্চয় রাসূল (সঃ) তাঁর কোন এক সাহাবীকে বলেছেন ঃ "সূরা আল-কাফিরূন পড়ে শেষ করে ঘুমাবে । এটা শিরক থেকে মুক্তকারী ।"

'রিসালাত আসবাব নাজাত আস-সু'উল মিন আস-সাইফ আল-মাসলুল' পুস্তিকায় এসেছে, যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, ইখলাসের কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অনেকগুলো শর্তকে যুক্ত করে, যারা দ্বীনে হানীফের অনুসারী তাদের শুধু এর মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে না। সে যদি আল্লাহ প্রেমিক হয় তাহলে তার ভালবাসা পূর্ণ হবে না কাফের মুশরিকদের সাথে শত্রুতা না করা ব্যতিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ **তোমরা কি দেখেছ, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ কিসের উপাসনা করতো, তারা আমার শত্রু, শুধু মহা বিশ্বের পরিচালক আল্লাহ ছাড়া।** (শুয়ারা ২৬ঃ ৭৭)

এটিই হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **সে সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা ও জাতিকে বললেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত বাকী যার উপাসনা তোমরা কর সেগুলোর হতে আমি সম্পর্ক মুক্ত, তিনি নিজেই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। আর এটা তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরস্থায়ী কালেমা করেছে। যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।** (যুখরুফ ৪৩ঃ ২৮)

ইব্‌রাহীমের অনুসারী হানীফ সম্প্রদায়ের ঈমামগণ এর উত্তরাধিকার লাভ করেছে। নবীগণও একে অপরের উত্তরাধিকার হয়েছেন। যখন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন তাকেও আদেশ করা হয়েছে আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) যে কথা বলেছিলেন সেটি বলার জন্য। তার সম্পর্কে আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাই অবতীর্ণ করেছেন আর তা হলো, *সূরা কাফিরূন*। (মাজমুআত আত-তাওহীদ)

নবী (সঃ) একে প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি। এজন্য তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এজন্য তোষামোদ করেননি। তারা তোষামোদি থেকে দূরে ছিলেন। মু'মিনরা তার উপর দৃঢ় ছিলেন। আর নবী (সঃ) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াদা ও জান্নাতের কথা বলে এবং পূর্বের ঈমানদারদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে মু'মিনদের শান্তনা দিতেন যেমন তিনি বলেছেনঃ "হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধর, তোমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত।" (আল-হাকিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন)

খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সঃ) এর উক্তি ঃ "তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'খণ্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। তখন এমন নিরাপত্তা আসবে যে একজন আরোহী সানা থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে কোন কিছুর ভয় শুধু আল্লাহকে ছাড়া আর তার ছাগলের উপরে বাঘের আক্রমণের ভয়ও থাকবে। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।"[২০]

---

[২০] হাদীসটি বুখারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। এরূপই নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিল। সর্বদা (মক্কী জীবনে) তার সাহাবীদেরকে পূর্বযুগের ঈমানে অটল থাকা ব্যক্তিদের ঘটনা বর্ণনা করে সাহস যোগাতেন দ্বীনের উপর

এ কথা তিনি (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, ঠিক সে সময়ে যখন তিনি কুরাইশদের বলতেন যা আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেনঃ

(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আমার কাছে ওয়াহী আসে যে, নিশ্চয় তোমাদের রব একজন। তাঁর কাছে সঠিক পথ কামনা কর ও ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং মুশরিকদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। (ফুসিলাত ৪১ঃ ৬)

এবং মাক্কী আয়াতগুলো তিনি বলেন ঃ

.

.

.

তোমরা তোমাদের শরিকদের ডাক এবং ষড়যন্ত্র কর, তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আল্লাহর ওলী তারাই যাদের জন্য আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি লোকদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ডাক তারা কোন সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারবে না। (আল-আ'রাফ ৭ঃ ১৯৫-১৯৭)

আয়াতগুলো মক্কায় অবতীর্ণ। এসব কারণেও তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম অত্যচারিরা কোন দিন মেনে নেয়নি। তাঁর দাওয়াতে তাদের মন খুশি হয়নি ও চক্ষু শীতল হয়নি। বরং তাদের উত্তেজনাকে উত্তেজিত ও তাদের বিধ্বংসীকাজকে ধ্বংসশীল করে তুলেছে। তাঁর সাথে কত দর কষাকষি করেছে তার হিসাব নেই। কিন্তু তিনি উবু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বাতিলের দিকে ও জোটের দিকে যারা ষড়যন্ত্র করত তাকিয়ে ছিলেন। বরং তাদের হিদায়াতের লোভ থাকা সত্ত্বেও পথে ঘাটেও তাদের বাতিলের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য দিতেন, তাঁর সঙ্গী সাথী কম থাকা সত্ত্বেও। বরং সব সময় তিনি তাই বলতেন, যা আল্লাহ বলতে নির্দেশ দিতেনঃ

অটল থাকার জন্য। এমনকি কেউ যদি এমন কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয় যা সহ্য করতে পারছে না তাকেও শান্তনা দিতেন। এ ধরনের পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছিল আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও তার অব্যহতির কথা বলেছেন, আমাদের যুগের অনেক দা'য়ীর মত নয় যারা সারা জীবন শুধু রুখসাত, মাকরূহ ও জরুরী পরিস্থিতির কথা শুনান। তাদের প্রতিটি দিনই তার অন্যস্থানে। তারা প্রত্যেক বাতিলে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করে। তারা, কোন জোরজবরদস্তী ছাড়াই, কুফরী ও শিরকী রাষ্ট্রের সংখ্যা ভারী করে। তাহলে কারা তাদের দ্বীন প্রকাশ্য পালন করবে?

আপনি যারা কাফির তাদের বলুন, অচিরেই তোমরা পরাজিত হবে ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (আলি-ইমরান ৩ঃ ১২)

শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের প্রচার ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, এই হচ্ছে রাসূল (সঃ)-এর সাহাবীদের অবস্থা এবং তারা মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট সহ্য করেছেন তার বিবরণ। তাহলে এই অজ্ঞদের অবস্থা কোথায় যারা ফিতনায় পড়ে বাতিলের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তাতে নতুন কিছু সংযোজন করেছে এবং অগ্রসর হয়েছে ও পশ্চাতে গিয়েছে, ভালবাসা করেছে, চাটুকারিতা করেছে, নির্ভর করেছে, বড় মনে করেছে, প্রশংসা করেছে? তারা ঐরূপ যেমনি আল্লাহ বলেছেনঃ **যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না।**[২১] আল্লাহর কাছে ইসলামের উপর অটল রাখার প্রার্থনা করছি। গোপনীয় ও প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী ফিতনায় পড়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, নবী (সঃ)-এর কাছে যারা ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছেন, যদিও তখন পর্যন্ত তারা শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্তি পাননি তবু তারা মুশরিক দ্বীনকে মন্দ ও তাদের প্রভুদের ত্রুটি বর্ণনা শুরু করে দিতেন। সেজন্যই তারা বিভিন্নরূপ অত্যাচারের স্বীকার হয়েছিলেন। (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ খণ্ড পৃষ্ঠা- ১২৪)

- শাঈখ হামদ বিন আতীক সূরা কাফিরূন সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর আদেশ হচ্ছে কাফিরদের বলা, তোমরা যে দ্বীনের অনুসারী আমি সে দ্বীন হতে মুক্ত। আর আমি যে দ্বীনের অনুসারী তোমরা সে দ্বীন হতে মুক্ত। এর স্পষ্ট অর্থ হলো, তোমরা কুফরীর উপর আছ এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া এবং আমি তাদের ও তাদের দ্বীন হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি নবীর (সঃ) অনুসারী ছিলেন তাকেই এ কথা বলতে হতো। এ কথা বলা ছাড়া তিনি দ্বীন প্রকাশকারী বলে বিবেচিত হতো না। তাই সাহাবীরা যখন বলতেন, তখন মুশরিকরা অত্যাচার করত। তাই তাদেরকে হাবশায় হিজরত করার আদেশ করেছিলেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করে প্রকাশ না করে চুপচাপ থাকার কোন সুযোগ থাকত তাহলে তারা তাই করতেন এবং পশ্চিম দেশে হিজরত করতে বলতেন না। (সাবিলুন নাজাত ওয়াল ফিকাহ পৃষ্ঠা ৬৭)

যারা মিল্লাতে ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বিষয়বস্তু বুঝে না তারা প্রায়ই একটি সংশয় করে মূর্খতা বশতঃ বলে থাকে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম (আঃ) আমাদের জন্য নয় বরং তা রহিত হয়ে গেছে। তারা এর প্রমাণে বলে, দুর্বলতার সময়ে মক্কায় দীর্ঘদিন অবস্থানের জন্য। কাবার আশে পাশে মূর্তিগুলো ভাঙ্গা হয়নি। এমনকি তাদের একজনের কাছে শুনেছি, যিনি প্রসিদ্ধ একজন শাঈখ যার কিতাবে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে।

---

[২১] আল-আহযাব ৩৩ঃ ১৪

তার এক বৈঠকে বলতে শুনেছি, যার সারাংশ হচ্ছে- "তোমরা যে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করতে চাও সে মিল্লাত থেকে রাসূল (সঃ) প্রথম দিকে বিরত ছিলেন। কেননা তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেছেন অথচ মূর্তি ভাঙ্গেননি। তাকে ও তার মত যারা আছে তাদেরকে আমরা বলব, যে জিনিস আপনাদেরকে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম বুঝত ও জানতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তা হলো, আপনাদের বুঝ শক্তির সংকীর্ণতা আর মূর্তি ভাঙ্গাকেই মিল্লাতে ইব্‌রাহীম মনে করা। আপনাদের ধারণা যে, মিল্লাতে ইব্‌রাহীম হচ্ছে গুড়িয়ে দেওয়া। এ কথা বলা হয় ইব্‌রাহীম (আঃ) যখন তার সম্প্রদায়ের মূর্তির উপর আক্রমণ করেছিলেন এবং সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। শুধু বড়টা বাদে, যাতে করে তারা মূর্তির অক্ষমতা বুঝতে পেরে তার কাছে আসে। আপনাদের কাছে যখন প্রমাণিত হবে না যে, নবী (সঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তির সাথে এরূপ ব্যবহার করেননি তখন আপনাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মনে হবে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম আমাদের কাছে পুরোপুরি রহিত। তার কোন কিছু আমাদের করার দরকার নেই। এর সাথে আপনাদের কথা প্রমাণ করে পূর্বের যত আয়াত এসেছে। অথবা মিল্লাতে ইব্‌রাহীম মেনে চলার জন্য যে উৎসাহ দেওয়া, তা হতে ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা, তাদের ও অন্যান্য নবীদের তাদের সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া সম্পর্কে পূর্বে যত আয়াত এসেছে তার সবই অনর্থক, অতিরিক্ত জিনিস যার পেছনে ভেতরে কোন ফায়দা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহ মহা পবিত্র এ হচ্ছে মহা মিথ্যা অপবাদ। আল্লাহ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমকে রহম করুন। তিনি বলেন,

"যাদের ইলমের পরিমাণ এরূপ হবে,
সে যেন তা চুপ ও গোপন করে ঢেকে রাখে।"

আল্লাহ অনর্থক কিছু করা থেকে পবিত্র। তাই তাঁর কিতাবে এমন কিছু থাকা অসম্ভব যার কোন ফায়দা নেই। এ ধরনের ভুলগুলো তেমন কোন সংশয় নয় তাই এর বিস্তারিত প্রতিবাদ লেখার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এ হচ্ছে তাদের ভুলের স্তম্ভ, যা এ মিল্লাত না বুঝার কারণে তৈরী হয়েছে। ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম কাকে বলে ও তার বিষয়বস্তু কি, সে মিল্লাত দ্বারা কি চাওয়া হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আপনি জেনেছেন সেটা হলো ইসলামের মূল ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -র অর্থ। আর কালিমাতে রয়েছে 'হ্যাঁ' ও 'না' বোধকের সমাহার। সে দুটি হচ্ছে শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা ও তাঁর ওলীদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা। আপনি জানেন এটিই হচ্ছে দ্বীনের মূল ও বিধানকৃত শরীয়ত। একে উঠিয়ে দেয়ার জন্য যদি সারা দুনিয়ার আলেম ও মূর্খরা একত্রিত হয় তারা কখনো প্রমাণ দ্বারা সক্ষম হবে না। আমরা আপনাকে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অবস্থা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সাথে তাঁর জাতির মু'মিন যারা ছিলেন তাদেরও। তাঁরা তাদের কওম থেকে কিভাবে আলাদা হয়ে গেছেন ও তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন তাদের অবস্থা বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ সরাসরি বলেছেন,

ইব্‌রাহীম (আঃ) ও যারা তাঁর সাথে ছিলেন তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ... (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

এরপর আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের মুখোমুখি হওয়ার আশা রাখে । (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৬)

এরপর আল্লাহ আরো বলেছেন এবং সতর্ক করেছেন ঃ

যে মিল্লাতে ইব্‌রাহীম হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত । (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৬)

এবং তুমি এও জেনেছো যে, এটিই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের মূল নীতি যার বাসনা আমরা করি, তার দিকে আহ্বান করি এবং পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে এতে অবেহলা করতে দেখি এবং জেনেছেন মিল্লাতটি হচ্ছে সেই পথ যে পথে আল্লাহর সাহায্য আসে । তাঁর দ্বীনকে সম্মান দান করেন । শিরক ও মুশরিকদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন । যখন ব্যাপার এমন হয়, এই পথের বিরুদ্ধে কথা বলা শাইখের সঠিক হয়নি, তিনি বলেন, নবী (সঃ) মক্কায় তের বৎসর মূর্তির মাঝে বসবাস করেছেন অথচ তিনি সেগুলোর থেকে মুখ ফিরাননি সেগুলোর সত্যতা অস্বীকার ও শত্রুতা প্রকাশ করেননি । তাকে বলতে হয়, আপনাকে খৃস্টান অথবা ইয়াহুদী, অগ্নীপূজক অথবা যা মনে চায় ভাবুন আমরা বলব, প্রকৃতভাবে ইব্‌রাহীম (আঃ) যেরূপ মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন আমাদের নবী (সঃ) সত্যিই সেভাবে মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন । তাঁর সেই দুর্বলতার যুগেও করেছিলেন কুরাইশদের অমনযোগিতার ফাঁকে । আমি এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের পরের কথা বলছি না । যেমন ইমাম আহমাদ, আবূ ইয়ালা ও বাজ্জার আলী বিন আবূ তালিব হতে হাসান সানাদে বর্ণনা করেছে- "আমি ও নবী (সঃ) কাবাতে আসলাম । তখন রাসূল (সঃ) আমাকে বললেন, বস এবং আমার কাঁধে উঠ । আমি তা করার জন্য গেলাম কিন্তু তিনি আমার মধ্যে দুর্বলতা লক্ষ্য করলেন, তিনি নামলেন এবং আমাকে নবী (সঃ) বসালেন এবং বললেন, আমার কাঁধে উঠ আমি তাঁর কাঁধে উঠলাম । তিনি আমাকে নিয়ে দাঁড়ালেন । তিনি আমার জন্য ঘোড়ার মতো হলেন আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে আকাশের দিগন্ত ধরতে পারতাম । আমি কাবা ঘরের উপরে উঠলাম । সেখানে পিতল বা তামার একটি মূর্তি ছিল আমি মূর্তির নাগাল পেলাম । রাসূল (সঃ) আমাকে বললেন, আছাড় মার । অতঃপর আমি সেটা আছাড় মারলে কাঁচের মত ভেঙ্গে চূড়মার হয়ে গেল । এরপর কাঁধ থেকে নামলাম । অতঃপর আমি ও রাসূল (সঃ) তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করতে শুরু করলাম । এমনকি বাড়ির পাশ দিয়ে কোন লোক

দেখে ফেলার ভয়ে লুকিয়ে চলতে লাগলাম।" এ ব্যাপারে হাইসামী তার "মাজমাউয যাওয়ায়িদ" গ্রন্থে একটি অধ্যায় লেখেছেন এ শিরোনামে [নবী (সঃ) কর্তৃক মূর্তি ভাঙ্গার অধ্যায়] তিনি একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন "কাবার উপর কতগুলো মূর্তি ছিল। আমি রাসূল (সঃ)-কে কাঁধে উঠাতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। অতঃপর তিনিই আমাকে উঠালেন এরপর আমি ভাঙতে শুরু করলাম।" অপর বর্ণনায় আরো বেশি এসেছে, "এরপর কাবার উপর আর কিছু রাখা হয়নি।" অর্থাৎ ঐ ধরনের কোন মূর্তি। লেখক বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী সবাই বিশ্বাসযোগ্য লোক। আবূ জাফর তাবারী তাঁর "তাহযীবুল আসার" গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি সেখানে কিছু ফিক্‌হী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। দেখুন পৃষ্ঠা নং ২৩৬ থেকে ২৪৩ পর্যন্ত মুসনাদে আলী অংশে। তাই আমরা এ ধরনের কথা কখনো বলি না, কেননা এটা আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশাও। এটা ছিল দুর্বলতার যুগে ক্ষমতার পরিধি। চাই মূর্তিটি কোন প্রতিকৃতি, কবর, ত্বগুত বা প্রথাই হোক না কেন কিংবা অন্য কিছু। প্রত্যেক স্থান ও কাল ভেদে তার আকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী। আমি এর দ্বারা বোঝাচ্ছি জিহাদ ও যুদ্ধ এবং এটিই হচ্ছে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশের সর্বোচ্চ স্তর।

এ সত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেই যে, দুর্বলতার যুগে রাসূল (সঃ)-এর সাথে মূর্তি ভেঙ্গেছেন এ কথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নেই তা সত্ত্বেও তিনি মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসারী ছিলেন। কঠোর সমর্থক ও অনুসারী ছিলেন এবং শক্তভাবে তা ধরেছিলেন। তিনি কখনো কাফিরদের সাথে একবারও নম্র আচরণ করেননি। তাদের বাতিল সম্পর্কে অথবা তাদের প্রভু সম্পর্কে কখনো চুপ থাকেননি। বরং তিনি এ কাজেই তেরটি বছর মক্কাতে ব্যাস্ত ছিলেন এবং বলতেন,

আল্লাহর ইবাদত কর ত্বগুতকে বর্জন কর। (আন্‌-নাহল ১৬ঃ ৩৬)

এর মানে এই নয় যে, তিনি তের বছর মূর্তির সাথে থেকেছেন আর তিনি সেগুলোর প্রশংসা করেছেন, গুণকীর্তণ অথবা তার সম্মানে শপথ করেছেন যা বর্তমান যুগের অনেক মূর্খ দা'য়ীরা করে থাকে। বরং তিনি মুশরিকদের ও তাদের কাজের ব্যাপারে বৈরিতা প্রকাশ করতেন। তাদের উপাস্যের সাথে সম্পর্কহীনতা শুরু হয়েছিল তাঁর ও তাঁর সাথীদের দুর্বলতার যুগেই। যা বিস্তারিত ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আপনি কুরআনের মাক্কী আয়াতগুলো গবেষণা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা কাফিরের সাথে রাসূলের মাক্কী জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

যারা কুফরী করেছে তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা ঠাট্টা করে বলে, এই কি সেই লোক যে তোমাদের উপাস্যের সমালোচনা করে। আর তারা দয়াময়ের উপাসনা করাকে অস্বীকার করে। (আম্বিয়া ২১ঃ ৩৬)

ইবন কাসীর বলেছেন, এর দ্বারা অর্থ গ্রহণ করেছেন, 'এই সেই লোক যে তোমাদের প্রভুদের গালিগালাজ করে এবং তোমাদের জ্ঞানকে অজ্ঞতা আখ্যায়িত করে।' আরও অনেক উদাহরণ আছে।

নবী (সঃ)-এর মক্কাতে দুর্বলতার যুগের অবস্থা সম্পর্কে আপনার কাছে আরো একটি উদাহরণ পেশ করছি, যা ইমাম আহমাদ মুসনাদে আহমাদে ও অন্যান্যরা বিশুদ্ধ সানদে বর্ণনা করেছেন। চিন্তা ও গবেষণা করে দেখুন কিভাবে নবী (সঃ)-কে কাফিররা তাদের রবের সমালোচনা করার কারণে সম্বোধন করে এবং তাদের দিকে দেখুন তাকে তারা একাকি ঘেরাও করে জিজ্ঞেস করে স্বীকৃতি আদায় করে বলে, তুমিই কি সেই লোক যে এই এই কথা বল? তিনিও তাদের জবাব দেন কোন প্রকার নম্রতা, ভয় ভীতি অথবা কোন ভীরুতা ছাড়াই স্পষ্ট, দৃঢ় ও শক্তভাবে- 'হ্যাঁ' আমিই এ ধরনের সমালোচানা করে থাকি।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, ইয়াকুব বলেছেন ঃ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা ইবন ইসহাক থেকে, তিনি বলেছেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন উরওয়া বিন যুবাইর, তিনি তার পিতা উরওয়া থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেছেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম আচরণ কি ছিল?" তিনি উত্তর দিলেন ঃ একদিন আমি *আল-হিজর*-এ গিয়েছিলাম, তাদের নেতৃস্থানীয় লোকের সেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ব্যাপারে আলোচনা করছিল। তখন তারা বলছিল, "আমরা মুহাম্মদকে (সঃ) ছাড়া অন্য কাউকে এমন সহ্য করিনি... সে আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে অজ্ঞতা বলে অভিহিত করে, আমাদের পূর্বপুরুষদের গালি দেয়; আমাদের দ্বীনের সমালোচনা করে এবং আমাদের সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেছে, আর আমাদের প্রভুদের গালি-গালাজ করে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার ব্যাপারে ধৈর্য ধরেছি।" বর্ণনাকারী বলেন, তারা এ ধরনের আলোচনায় যখন মত্ত, ঠিক তখনই রাসূল (সঃ) তাদের মধ্যে এসে হাজির হলেন। তিনি হেঁটে *আর-রুকন* -এর দিকে আসলেন। এরপর কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে শুরু করলেন। যখন তিনি তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা তাকে তাদের সে কথা দ্বারা কটাক্ষ করতে লাগল। এর প্রভাব তাঁর চেহারাতে আমি বুঝতে পারলাম।

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ও অনুরূপভাবে কটাক্ষ করলে তিনি বললেন, *"হে কুরাইশ সম্প্রদায়! শুনে রাখ, ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন-মরণ! আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের জবাই (হত্যা) করার জন্য।"* তাঁর এই কথাগুলো তাদের এত প্রখরভাবে আঘাত করে, যে এমন কোন লোক ছিল না যার মাথায় পাখি বসবে না (অর্থাৎ ভীত, আতঙ্কিত ও হতবাক হয়েছিল)। এমনকি এই ঘটনার পূর্বে তাদের মধ্যে যে নবী (সঃ) এর প্রতি সবচেয়ে কঠোর ও বদ প্রকৃতির ছিল, সেও সবচেয়ে নরম ও দয়ার সুরে বলছিল; এমনকি তাদের একজন বলতে বাধ্য হয়, 'হে আবুল কাসেম! আপনি চলে যান হে ন্যায়পরায়ণ! নিশ্চয়, আল্লাহর শপথ, আপনি মূর্খ নন।' এরপর রাসূল (সঃ) চলে গেলেন।

এর পর দিন, তারা *আল-হিজর*-এ জমায়েত হলো, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তারা একে অপরকে জিজ্ঞেসা করলো, 'তোমাদের কি মনে আছে সে তোমাদের কি বলেছিল, আর তোমরা তাকে কি বলেছিলে? তার কথার মাত্রা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তোমরা যা ঘৃণা কর তা সে তোমাদের সামনে অভিব্যক্ত করেছিল, অথচ এরপরও তোমরা তাকে যেতে দিলে!' যখন তারা এরূপ আলাপ করছিল সে সময় রাসূল (সঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তারা সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগলো, 'তুমিই কি সেই লোক, যে আমাদের দ্বীনকে ও উপাস্যগুলোর (মূর্তি) ব্যাপারে পরিহাস কর।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সঃ) তাদের বলেন, 'হ্যাঁ, আমি সেই লোক, যে এ কথা বলি।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমি এক লোককে দেখলাম, রাসূল (সঃ)-এর চাদর ধরে টানছে, তখন আবূ বকর (রাঃ) তাদের ও নবী (সঃ) এর মাঝে লাফ দিয়ে এস দাঁড়ালেন। আর ক্রোন্দনরত অবস্থায় বললেন, **তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার রব আল্লাহ ?** [গাফির ৪০ঃ ২৮]

এরপর তারা রাসূল (সঃ)-কে ছেড়ে চলে গেল। কুরাইশদের পক্ষ থেকে নবী (সঃ)-এর প্রতি করা দুর্ব্যবহারের মধ্যে এর চেয়ে কঠিন দুর্ব্যবহার আমি দেখিনি।[২২]

মুসনাদের অপর এক বর্ণনায় (২০৪/২) রয়েছে- অপর এক ঘটনায় নবী (সঃ) কাবার কাছে সালাত আদায় করছিলেন, তখন ওকবা বিন আবু মুইত্ব আগমন করে নবী (সঃ)-এর কাঁধ ধরে এবং তাঁর গলায় কাপড় পেচিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ধরে। এমন সময় আবূ বকর (রাঃ) লোকটির ঘাড়ে হাত দিয়ে রাসূলকে (সঃ) তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং বলেন, "তোমরা এমন লোককে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ, যখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে।"

তাই নবী (সঃ) এর সেই অবস্থা নিয়ে চিন্তা করুন, যার বর্ণনা ফেরেশতারা দিয়েছেন। যা সহীহুল বুখারীতে এসেছে ঃ

"তিনি মানুষের মধ্যে পার্থক্য (ভাঙ্গন) সৃষ্টি করেছেন।" তাহলে তাঁর যুগের কাফেরদের সাথে এ অবস্থা নিয়ে ভেবে দেখুন। যে তাঁর দ্বীনের বিরোধী ছিল তাদের সাথে তাঁর প্রকাশ্য শত্রুতার ঘোষণা, পথ ও মতের ভিন্নতা স্পষ্ট বৈরিতা কিরূপ ছিল তাও ভেবে দেখুন। আমাদের সময়ের দ্বীনদাররা তো বাতিলপন্থীদের প্রতি নির্ভরশীল। তারা তাদের সাথে চাটুকারিতা, ভাল ব্যবহার, সাহায্য-সহযোগিতা সবই করে, তাদের কোন ব্যাপারে শত্রুতা ও বৈরিতা পাওয়া যায় না। বরং তারা দেশ ও সমাজের কল্যাণে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। তারা একই দূর্গে বসে এবং একই স্তনে দুধ পান করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আল্লাহই সহায়ক।

[২২] মুসনাদ- হাদীস নং ৭০৩৬, আহমাদ শাকেরের তাহকীক; তিনি বলেছেন, এর সানাদ সহীহ্।

- এদের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বলেন, 'তারা ফিতনার গভীর জলে ডুব দিয়েছে। তারা তাদের অন্তরকে মানিয়ে নিয়েছে জালিম ও বাতিলপন্থীদের সাথে। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে বড় খারাপ মনে হয়। তাদের কাছে স্বেচ্ছায় যাওয়া আসা করায়। তাদের হাতে দুনিয়াকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ধ্বংস করার যে অস্ত্রপাতি আছে তা থেকেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তাহলে ঈমানে প্রশান্তি লাভকারী আত্মা কোথায়। যখন ঈমানীনের দাবীদাররা বাতাসের সাথে প্রতিটি ময়দানে চলে যেত। এ অবস্থা কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ যাদের মায়ের কথা আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বর্ণনা করেছেন তাদের সাথে তারা হচ্ছে ঐ লোক যাদের ফলাফল আল্লাহর কথায় নাযীল হয়েছিল ঃ **তোমরা তাদেরকে মনে কর যে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা তারা নিয়ে গর্ববোধ করে এবং তারা যা করেনি তা করেছে বলে যারা পছন্দ করে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।** (আলি-'ইমরান ৩ঃ ১৮৮)

তারা বিদ'আতী ও গোমরাহী নিয়ম মেনে চলতে পেরে খুশি এবং তারা পছন্দ করে ও ভালবাসে যে, মানুষ তাদেরকে সুন্নাতের ও ইখলাসের অনুসারী বলে প্রশংসা করুক। এটা পাওয়া যায় বেশীরভাগ ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে যারা জ্ঞান অর্জন করে ও পথচ্যুত এবং সিরাতে মুস্‌তাকিমের ইবাদত থেকে বিমুখ এমন লোকদের মধ্যে।' (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ১২৭ পৃষ্ঠা)

- এখানে একটি মাসআলা অনেকের নিকট দুর্বোদ্ধ্য মনে হয়। তা হলো, তিনি (সঃ) কিভাবে একই সাথে তাদের প্রভুদের ও দ্বীনের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছেন, যেমনটি এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে এসেছে এবং আল্লাহর এ কথার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন ঃ

আল্লাহ ব্যতীত মুশরিকরা যে উপাস্যকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহকে গালি দিবে। (আল-আন্‌আম ৬ঃ ১০৮)

আল্লাহর তাওফিক চেয়ে এ সম্পর্কে আমরা বলব, বাতিল প্রভুদের দোষ-ত্রুটি ও তার বোকামী ও তার শক্তির পরিধি সম্পর্কে আলোচনায় মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের যে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে গেছে, যদি সেগুলোকে কেউ গালি বলেন তাহলে মনে রাখুন সেগুলো স্বতন্ত্র কোন গালি নয়। এর আসল উদ্দেশ্য হলো, লোকজনকে তাওহীদের বর্ণনা দেওয়া।

- আর তা কেবল সম্ভব হবে কল্পিত এই উপাস্যগুলোর ইবাদাতকে বাতিল বা বর্জন করা, তার সাথে কুফরী করা (অস্বীকার) এবং তার মিথ্যা ভিত্তির বর্ণনা করার দ্বারা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

নিশ্চয় যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক তারাও তোমাদের মত আমারই বান্দা। তোমরা তাদের ডাক। যদি তোমরা তোমাদের ডাকা উপাস্যের ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহলে তারা সাড়া দিবে। তাদের কি পা আছে হাটবে? হাত আছে ধরবে? অথবা চোখ আছে যে দেখবে, কান আছে যে শুনবে? হে নবী! আপনি বলে দিন তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক এরপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর। তোমরা কিছুই করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার অভিভাবক সেই আল্লাহ্ যিনি ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎ লোকদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের কোন উপকার বা সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারবে না। (আল-আরাফ ৭ঃ ১৯৪-১৯৭)

আর ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা ঃ

ওহে পিতা! আপনি কেন এমন উপাস্যের উপাসনা করেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন উপকার করতে পারে না। (ইব্রাহীম ১৪ঃ ৪২)

আল্লাহর বাণী সূরা আন-নাজমেঃ

তোমরা কি লাত, উজ্জা ও অপর মানাতে ছালেছার দুরবস্থা দেখেছ? তোমরা শুধু পুত্র সন্তানের পিতা আর তিনি মেয়ে সন্তানের পিতা এটা বড়ই অসম বণ্টন। এগুলো এমন কতকগুলো নাম যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে এবং কোন প্রমাণ ও সত্যতা নাযিল করেননি। তারা কল্পনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া আর কিছু করে না। আর নিশ্চয় (রাসূলের মাধ্যমে) তোমাদের নিকট হিদায়াত এসেছে। (আন-নাজম ৫৩ঃ ১৯-২২)

এমনিভাবে এই মূর্তিগুলোর যত বর্ণনা এসেছে সবই যেন এরূপ, এরা ইবাদাতের হকদার নয়। অথবা একে ত্বগুত বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথবা এর ইবাদতকে শয়তানের ইবাদত বলা হয়েছে। এ ইবাদতও তার জাহান্নামের লাকড়ী হবে সে কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি।

- তেমনিভাবে কার্যক্ষেত্রে তাওহীদকে প্রকাশ করা এগুলোর সাথে শত্রুতা, ঘৃণা, বৈরিতা ও অস্বীকার করা ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

. .

তিনি বললেন, তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা কিসের উপাসনা করতে। যেগুলো আমার শত্রু, শুধু মহাবিশ্বের পরিচালক আল্লাহ ব্যতিত। (শুয়ারা ২৬ঃ ৭৫-৭৭)

আল্লাহর বাণী ঃ

হে আমার জাতি! তোমরা যার উপাসনা কর আমি তা হতে মুক্ত। (আল-আনআম ৬ঃ ৭৮)

... এবং সূরা আল-কাফিরূন শিরক হতে মুক্ত হওয়ার ও পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে একত্রিত করে আলোকপাত করেছেন। এ সবই নিছক গালি নয়, যে গালিগালাজ করা আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যার স্বভাব ঝগড়া করা, গালাগাল করা সে কোন কারণ ও লাভ ছাড়াই আল্লাহকে গালি দেয়, শত্রুতা ও মূর্খতাবশতঃ কখনো অনিচ্ছায়। বিশেষ করে, যারা তাওহীদে রুবুবিয়াহ মানে তারা যেমন কুরাইশি কাফিররা, তেমনিভাবে তুলনামূলক অবস্থা। মিল্লাতে ইব্‌রাহীম চায় ভয় দেখাতেও সতর্ক করে দিতে ঐ ব্যক্তিকে যে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করে এবং এর দ্বারা মানুষকে কুফরীর দিকে আহ্বান করে ও বৈরিতা সৃষ্টি করে মিল্লাত মিল্লাতের অনুসারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং কোন ক্ষতি সাধন করতে সব ক্ষেত্রে। এর অসম্মান, জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস, তার আদেশের ভ্রান্তিতা, আল্লাহর দ্বীনের সাথে তাদের স্পষ্ট সাংঘর্ষিকতা সৃষ্টি হয় দ্বীনত্যাগ ও সুদ গ্রহণের অনুমতির দ্বারা। আর পাপাচার করার পথ সুগম করা, আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করা, যেমন ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, চুরি, মদপান, কুফরী ও ফাজেরী আইন কানুন মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে যে অন্যায় সংঘটিত হয় তার উল্লেখ করা। আর ও ধরনের বিষয় উল্লেখ করে দাওয়াত দিতে যদিও আবদে ইয়াসিক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা একে গালি বলে অভিহিত করেছেন অথবা লম্বা কথা বলে যা করা ওয়াজিব, যেমন ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, দা'য়ীগণ তা প্রকাশ করছেন ও প্রচার করবেন শুধু তাদেরকে গালাগাল ও তাদের রাষ্ট্র ও বিচারক এবং সংবিধানকে গালি গালাজের ব্যাপারে উত্তেজিত করার জন্য। এ কাজ নিষেধ করা হয়েছে কেননা এতে করে জাহিলিয়াত ও তাঁর দ্বীন ও পথকে গালি দেওয়ার কারণে পাল্টা গালি দিবে যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের সে দ্বীন মিথ্যা ও ভুয়া, তারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দেয় আবার কখনো উলুহিয়্যাতেরও স্বীকৃতি দেয় শুধু বিচার ও শরীয়াতের ক্ষেত্র ব্যতিত। তাফসীরকারকগণ বর্ণনা করেছেন ঃ

... তারা আল্লাহকে গালি দিবে ...

অর্থাৎ তাদেরকে গালি দেওয়ার কারণে তোমাদের কাজকে গালি দিবে।[২৩] আর এ গালি পড়বে আল্লাহর উপর, যা শক্রুতা ও মূর্খতা বশতঃ দিয়ে বসবে। যেমন, কোন লোক অপর লোকের পিতাকে গালি দিলে পাল্টা সেও তার পিতাকে গালি দেয়। যদিও তারা দুই ভাই হয় একই বাপের। কেননা রাগ, ক্রোধ ও উত্তেজনা অন্ধ বিতর্ক ও ঝগড়ায় লিপ্ত করে মানুষকে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ দেয় না। অর্থাৎ তাকে গালি দিতে বাধ্য করে। মুহাম্মাদ রশীদ রেজা তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এ কাজের উদ্দীপক হলো, গালি দেওয়ার ইচ্ছা। যার উদ্দেশ্য হলো গালি দেয়া বস্তুকে অপমান করা। আর গালিদাতা তার সম্পর্কিত ব্যক্তিকে অপমান ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য করে না। এর উল্টো হলো, কৌশল ঢুকানো, কাজ করার আহ্বান করা, তাকে সম্বোধন করা, তার মনোযোগ আকর্ষণ করা, এ সমস্ত উপাস্যের জালিয়াতি প্রকাশ করা যে তারা শুনে না, দেখে না, লাভ ক্ষতি করতে পারে না, কাছে আসতে পারে না, সুপারিশ করতে পারে না, নিজের ও তার অনুসারীদের কোন উপকার করতে পারে না ইত্যাদি বলে ঘুরিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ইব্রাহীমের (আঃ) কাহিনী তাঁর জাতির সাথে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন, তাদের কাল্পনিক রবের জালিয়াত সম্পর্কে কিভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলেন এবং তাদের কে উত্তেজিত ও জাগ্রত করে তুলেছেন শুধু উত্তেজনা বা অপমান করার জন্য। তারা যেন চিন্তা ভাবনা করে এবং নিজেদের বিবেকের সাথে তার আহ্বানকে বিচার বিশ্লেষণ করে। ভেবে দেখুন, কিভাবে তিনি তাদের কাজকে ঘৃণা করেছেন এ জন্য তারা উল্টে যেত, পরস্পর বিরোধিতা করতো ও নিস্তেজ হয়ে যেত। এ অবস্থায় তাদেরকে জোরের সাথে বলতেন ঃ

তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের জন্য আমার আফসোস। তোমরা কি বুঝবে না? (আম্বিয়া ২১ঃ ৬৭)

পূর্বের হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন আমরের কথারও যদি চিন্তা করতেন, যখন তিনি নবী (সঃ)-কে বলা কুরাইশীদের কথা উল্লেখ করেছেন, "তুমিই কি সেই লোক যে এই, এই বল? এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তাদের কাছে খবর গেছে নবী (সঃ) কর্তৃক তাদের উপাস্য ও দ্বীনকে দোষী বলে অভিহিত করার, তখন তারা এ কথা বলেছিল। আর আরবদের নিকট দোষ ধরা মানে গালি অথবা গালির সমতুল্য। ইবন তাইমিয়্যাহ তার "*সারিসুল মাসলূল আলা খাতিমির রাসূল*" গ্রন্থে গালির প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে এ ধরনের কথাই বলেছেন ৫২৮ নং পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য পৃষ্ঠায়। তবে এ স্থানে নিছক গালি ধরা যাবে না যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[২৩] দ্রষ্টব্যঃ তাফসীর আত-তাবারী

নবী (সঃ) আল্লাহ যে তাওহীদ দিয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তার প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের উপর ছিলেন যার অনুসরণ করতে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছিলেন। আর সবই ঐ মুশরিকদের কাছে গালি বলে বিবেচিত। কেননা এটা হচ্ছে তাদের দ্বীনের বাতিলতা ও তাদের কাল্পনিক উপাস্যের উলুহিয়াতের অযোগ্য হওয়ার প্রচারণা। যার গুণকীর্তণ তারা করে থাকে এবং এটাই হচ্ছে তাদের উপাস্যের ত্রুটি যা তারা বলেছেন। তেমনিভাবে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে গোমরাহী বলে অভিহিত করা নিছক উত্তেজনা সৃষ্টি নয় বরং তাদেরকে অন্ধ অনুসরণের জন্য ধমকি দেওয়া ও তাদের গোমরাহীর অনুকরণ নিষেধ করা।

আল-কাসেমী, আর-রাযী থেকে তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, তার কথাঃ এ আয়াতে যারা দ্বীনের দাওয়াত দেয় তাদের জন্য শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। আর তা হলো, যার উদ্দেশ্যে কোন লাভ নেই তা নিয়ে ব্যাস্ত থাকা অনুচিত। কেননা মূর্তির গুণই হচ্ছে জড় পদার্থ, ভাল মন্দ করতে পারে না, এ কথা বলাই তার প্রভুত্বের যোগ্যহীনতার জন্য যথেষ্ট, গালি দেয়ার কোন দরকার নেই। কিন্তু এটাও কাফিররা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় না। যদিও তা সরাসরি গালি নয়। তবুও তা তাদের রবের প্রতি এটি অসম্মানজনক আচরণ ও অস্বীকার করার শামীল, এজন্য তারা একে গালি বলে অভিহিত করেছে যেমনিভাবে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে গোমরাহ বলাকে ভর্ৎসনা মনে করে তারা বলেছেঃ আমাদের বুদ্ধিকে সে বোকামি বলেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা ও গালাগাল করেছে আমাদের দ্বীনকে বাতিল বলেছে, আমাদের জামাআত ভেঙে ফেলেছে ও উপাস্যদের গালিগালাজ করেছে।

শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নবী (আঃ) এর জীবনের যে ছয়টি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করেছেন তার দ্বিতীয়টিতে বলেন, যখন নবী (সঃ) কর্তৃক কাফিরদের দ্বীনকে গালাগাল ও তাদের জ্ঞানীদের মূর্খ বলে অভিহিত করার খবর স্পষ্ট হলো তখন তারা রাসূল (সঃ) ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করল এবং বলল, আমাদের বুদ্ধিকে বোকামি, দ্বীনের ত্রুটি, প্রভুদের ভর্ৎসনা করেছে। এ কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, তিনি ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা মরিয়মকে, ফেরেশতা সৎ লোক কাউকেই গালমন্দ করেননি। কিন্তু যখন তিনি বলেছেন, "উপকার অপকার কোনটাই করতে জানে না" তখন এ কথাকেই তারা গালমন্দ ধরে নিয়েছে।

সারকথা, এসব কিছু নিছক গালির অন্তর্ভুক্ত নয় যা আল্লাহ আয়াতে নিষেধ করেছেন। আর এর দ্বারা এটি উদ্দেশ্যও নয়। এ সত্ত্বেও যদি কোন কাফির আল্লাহকে অথবা ইসলাম দ্বীনকে গালাগাল করে তাহলে মুসলিমের কর্তব্য হলো, তার প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করা তাওহীদের দ্বারা ও দ্বীনের প্রকাশ দ্বারা। তাকে কানভাবেই ছাড়া যাবে না। আর এ গালাগাল শুধুমাত্র শত্রুতার কারণেই হবে, তবে তা হবে জ্ঞানের দ্বারা দলিল প্রমাণ পেশ করে। এ ছাড়া যদি আমরা হিসাব করি যে, সে যা করে করুক, তাহলে আমরা আমাদের দ্বীন পুরোপুরিই ছেড়ে দিলাম এবং এ অবস্থান থেকে নেমে কাফিরদের নয়নমণি হয়ে গেলাম। কেননা এর পুরোটাই ঈমানের মূলে ও ত্বগুতের কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সতর্ক হোন, এর উপর ভিত্তি করে ভেবে দেখুন আধুনিক যুগের ত্বগুতদেরকে কি বলা যাবে সংবিধান, আইন কানুন, বিচারক, বিচার সম্পর্কে। এর অর্থ শুধু পাথরের মূর্তি ভাঙ্গার উপর সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না বরং এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করুন।

- সূত্রগুলো মুস্তাহাব ক্ষেত্রে ও মুবাহ্ ক্ষেত্রে যখন সঠিক হয়, ওয়াজিবে নয়। তাহলে দ্বীনের ওয়াজিব থেকে কোন ওয়াজিবও ছাড়া যাবে না। যেমন তাদের তৎপরতাকে বন্ধ করার জন্য তাওহীদের বর্ণনা দেওয়াও মুশরিকদের দ্বীনকে বাতিল বলা। যেমনি কেউ কেউ বুঝে থাকেন। যদি ক্ষেত্রকে প্রসারিত করি তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনের সুনামকে নষ্ট করে ফেলবো। এ জন্যই আবূ বকর বিন আরাবী আহকামুল কুরআনের ৪৭৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, (দ্বিতীয় মাসয়ালা) এটা প্রমাণ করে হকদারকে পুরা হক দিতে হবে যখন এমন কোন কাজ করে যা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর তাহলে তার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। এতে গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তার এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, যখন এটি ওয়াজিব হবে তখন তা পুরোপুরি আদায় করতে হবে। আর যদি জায়েয হয় তাহলে তার জন্য এ কথা প্রযোজ্য, আল্লাহই ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ রশীদ রেজা বলেন, **"এবং এর অন্তর্গত"** যা বর্ণিত হয়েছে আবূ মানসুর থেকে তিনি বলেছেন, যে গালি খাওয়ার হকদার তাকে গালি দেওয়াতে আল্লাহ কিভাবে নিষেধ করলেন যে তাকে যেন গালি না দেয়া হয় যে হকদার না। অথচ আমরা আদিষ্ট হয়েছি যুদ্ধ করার জন্য যখন তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। অন্যায়ভাবে মু'মিনকে হত্যা করা পাপ কাজ? তেমনিভাবে নবীকে তাদের কাছে তাবলীগ ও কুরআন তিলাওয়াত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যদিও তারা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। মুশরিকদের উপাস্যকে গালি দেওয়া মুবাহ কাজ, ফরজ নয়। তেমনিভাবে তাবলীগ করাও। আর যে কাজ মুবাহ সে কাজে সমালোচনার জন্ম হলে তা করতে নিষেধ করা হয়। আর যে কাজ ফরজ তাতে যে পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হোক না কেন পালন করে যেতে হবে।

দ্বীন প্রকাশ করা ওয়াজিব সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তা কেউ যদি বাতিল করতে যুক্তি দাঁড় করে তাহলে তার প্রতিবাদ করা হবে ঐ কথা দিয়ে যা বুখারী তার সহীতে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর বাণী ঃ **তোমার সালাতকে বেশী উচ্চস্বরেও না আবার একদম নীচু স্বরেও না মাঝামাঝি স্বরে আদায় কর।**[২৪] আয়াতটি মক্কায় রাসূল লুকিয়ে সালাত আদায় করার সময় অবতীর্ণ হয়েছে। যদি তিনি উচ্চস্বরে পড়তেন তাহলে মুশরিকরা শুনে কুরআন অবতরণকারী এবং যে নিয়ে এসেছে তাদের গালাগাল করত তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন, **তোমার সালাতকে বেশী উচ্চস্বরেও না আবার একদম নীচু স্বরেও না মাঝামাঝি স্বরে আদায় কর।**[২৫] আপনি সালাতে কুরআন এমন জোরে পড়বেন না যাতে মুশরিকরা শুনে ফেলে আবার এতো আস্তে পড়বেন না যে, আপনার সাথীরাও শুনতে না পায়। বরং এর মাঝামাঝি পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

তাই আল্লাহর দিকে আহ্বান প্রতিষ্ঠিত ও মুসলিমদের দ্বীনও প্রকাশ্য। আর মক্কাতে মূর্তিকে বর্জন করার ব্যাপারটি যেহেতু এমনই ছিল তাই সলাতের কিরআতের শব্দ হ্রাস করা হয়েছিল এ ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য। সে জন্য কোন প্রভাবও ফেলতে পারবে না। কুরআন সর্বস্থানে প্রসার লাভ করবে মুশরিকদের নাকে চুনকালি দিয়ে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমও প্রকাশকারী, কিন্তু প্রকাশ করলে ফল হত যেই ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করত তাকেই মুশরিকরা দ্বীনত্যাগী বা কাফির বলত তাদের দ্বীনে ও মূর্তি হতে।

---

[২৪] বানী ঈসরাইল ১৭ঃ ১১০

[২৫] বানী ঈসরাইল ১৭ঃ ১১০

তাই সর্বদিক বিবেচনা করে এ আদেশ করা হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। এর সাথে যোগ করুন সালাতে কিরআত জোরে পড়া, যাতে মুসল্লীরা ছাড়া অন্যরাও শুনতে পারে, সলাতের ওয়াজিব কোন বিষয় নয়। তাই এই সমস্যা বন্ধ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত সূত্র মতে প্রয়োজনে মুবাহ ও মুস্তাহাব বিষয় ছাড়া যাবে তবে ওয়াজিব নয়। তাই এটা পরিত্যাগ করা হয়নি ওয়াজিব হওয়ার কারণে নয়। বরং যথেষ্ট হচ্ছে এমন শব্দে তিলাওয়াত করা ইমামের পিছনে যারা থাকে তারা যেন শুনতে পায়, আর এটি হচ্ছে রাসূলের প্রতি আল্লাহর আদেশ আল্লাহর বাণী ঃ

আর আপনি একদম নীচু স্বরেও পড়বেন না।

অর্থাৎ, আপনার সাহাবীদের সুবিধা অনুযায়ী।

- এখানে আরো একটি সংশয় যার দ্বারা অনেকেই দলীল দেয় তা হল আবূ তালীব কর্তৃক রাসূল (সঃ)-কে আশ্রয় দান। যাকে আল্লাহ কুরআনের ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

তিনি আপনাকে এতিম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেননি? (আদ্-দুহা ৯৩ঃ ৬)

তেমনিভাবে কাফির কর্তৃক মুসলিমকে প্রতিবেশী ও নিরাপত্তা, অনুরূপ আরও উদাহরণ, যার একটি ইমাম বুখারী তার সহীহ্তে বর্ণনা করেছেন মক্কাতে ইবন দুগনাহ কর্তৃক আবূ বকরকে আশ্রয় দান সম্পর্কে। তেমনি নাজ্জাশী কর্তৃক তিনি খ্রিস্টান অবস্থায় মুসলমান হওয়ার পূর্বেই, মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়া এ ধরনের আরো ঘটনা। তাদের এ সংশয়ের মূল কথা, কিভাবে একজন মুসলিম এ অবস্থায় তার আকীদা ও দ্বীনের সাথে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা মেনে নিতে পারে? তাহলে মিল্লাতে ইব্রাহীমের নীতি মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মূলনীতির পরিপন্থী হল না? আল্লাহর তাওফীক কামনা করে এর উত্তরে আমরা বলব, এ ধরনের ঘটনার সাথে মিল্লাতে ইব্রাহীমের কোন সংঘর্ষ নেই। এমনকি নবী রাসূলদের দাওয়াতের সাথেও। এর কারণ এমন ব্যাপক যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি দুটি দিক থেকে।

প্রথমত ঃ তাদের বাতিল প্রভুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও আল্লাহ ব্যতীত সে সমস্ত ত্বগুতের ইবাদত করা হয় তার সাথে কুফরী করা।

দ্বিতীয়ত ঃ বাতিলের উপর অটল থাকা মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা। যা ইতোপূর্বেও আলোচনা করেছি। প্রথমটি প্রত্যেক মুসলিমের কাছে কাম্য। কোন প্রকার অবহেলা ও বিলম্ব ছাড়াই এ পথের প্রথম পদক্ষেপেই। বরং মুসলিম দলের প্রচার ও প্রকাশ করা ওয়াজিব। যাতে করে মানুষ দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে জানতে ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

আর দ্বিতীয়টি প্রকাশ বা ঘোষণা করবে না বাতিলের উপর অটল ও হক্বপন্থীদের সাথে শত্রুতা করা ব্যতিত। আর আবূ তালিব তেমনি একজন ব্যক্তি যদিও তিনি বাতিলের উপর অটল ছিলেন তথাপিও হক্ব ও হক্বপন্থীদের শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেননি। বরং তিনি ছিলেন এর উল্টোটা। তিনি ছিলেন হক্বপন্থী ও রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যকারী। যার বর্ণনা আব্বাস (রাঃ) বুখারীর হাদীসে দিয়েছেন। যেমন তিনি নবী (সঃ)-কে বলেছেন, "আপনি আপনার চাচা থেকে কতই না উপকার পেয়েছেন? তিনি আপনাকে বিপদাপদে বেষ্টন করে রাখতেন, সাহায্য করতেন এবং আপনার কল্যাণের জন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। (হাদীস)

যদিও এটা হয়েছিল স্বজনপ্রীতি ও বংশীয় বন্ধনের কারণে। এ জন্য পড়ুন আল্লামা শানক্বেত্বী রচিত "আযওয়াউল বয়ান" এর তৃতীয় খণ্ড (পৃষ্ঠা ৪১-৪৩, ৪০৬, ৪০৭) পাপীষ্ট লোক দ্বারা এবং স্বজনপ্রীতির বন্ধন, বংশীয় টান দ্বারা যদিও এ বন্ধন ও টান মূলত বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও তাদের দ্বারা দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে থাকে। সে অধ্যায়ে এর প্রমাণ এই সাহায্যকারী পাপী লোক আবূ তালিব, যার হিদায়াতের ও সত্যের আনুগত্যের আশা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। তখন বিরোধী যুদ্ধাদের কাতারে সে না দাঁড়ায় বরং যদি দাঁড়ায়ও তবে তার কতক অনুসারীকে প্রতিহত করার জন্য যার অবস্থা এমন তাহলে তার ব্যাপারে বিশেষ দাওয়াত দেওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য নবী (সঃ) কখনো তাঁর চাচা আবূ তালিবকে দাওয়াত দেওয়া হতে নিরাশ হননি। যিনি বলতেন, "আল্লাহর শপথ! আমি মাটিতে দাফন না হওয়া পর্যন্ত তাদের দলবল তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোমার উপর যে কাজ দেওয়া হয়েছে তুমি তা প্রচার কর। এর দ্বারা সুসংবাদ নাও এবং চক্ষু শীতল কর।"

এসব কিছুর পূর্বে এখানে আরেকটি বিষয় আছে তাহলো, প্রথম উক্তি যা অবস্থানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নবী (সঃ)-এর চাচার এরূপ প্রতিরোধ অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও দাওয়াতী কাজের হিসাবে ও দ্বীনি নীতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার নম্রতা দেখাননি। বরং তাঁর চাচা তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে জানতেন এবং নবী (সঃ) কর্তৃক তাদের বাতিল উপাস্যের শত্রুতা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনার কথা শুনতেন। নবী (সঃ)-কে চাপ প্রয়োগ করার জন্য আবূ তালিবের মাধ্যমে প্রয়াস চালিয়েছে যাতে করে তিনি দাওয়াতী কাজ থেকে তাদের উপাস্যের ত্রুটি বর্ণনা ও তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলা থেকে বিরত থাকেন। যখন আবূ তালিব এ চেষ্টা করতে চাইলেন। রাসূল (সঃ) তার সাথে আপোস করেননি এবং দ্বীনের কোন বিষয় থেকে তাঁর সেই চাচার ক্ষতির কথা ভেবে সরে যাননি, যিনি তাকে ঘিরে রাখতেন, সাহায্য করতেন ও আশ্রয় দিতেন। বরং তাকে এ প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছেন ঃ

"আল্লাহর শপথ! আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা আমার পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয়। যদি কেউ এই মূর্খকে আগুনের একটি শিখা বানিয়ে দেয় তবুও না।" যেমন তাবারানী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর উপর অটল ছিলেন। তাঁকে তাঁর কাফির চাচার প্রতি মায়া ও ভালবাসা টলাতে পারেনি। এটা হবেই বা কিভাবে তিনিই তোমাদের অনুকরণীয় মডেল ও মহা দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

আপনি এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে বন্ধু বানিয়েছে যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই, আত্মীয় হোক না কেন। (মুজাদালা ৫৮ঃ ২২)

... যদিও তাঁর আকাংখা ছিল তাকে হিদায়াত করার। এটা হচ্ছে এক ব্যাপার আর মায়া ও ভালবাসা আরেক ব্যাপার। নবী (সঃ)-কে তাঁর চাচা আশ্রয় দান, রক্ষা করা ও প্রতিরোধ করে বিপদ দূর করা সত্ত্বেও তার মৃত্যুর পর শান্তির দু'আ করতে পারেননি। বরং বিশেষ করে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এজন্য তাঁর প্রতি নাযিল করেছেনঃ

নবী ও যারা ঈমানদার তাদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে... (আত্-তাওবাহ্ ৯ঃ ১১৩)

তিনি এ কাজে ছিলেন না যখন আলী (রাঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন, নিশ্চয় আপনার বৃদ্ধ গোমরাহ চাচা মারা গেছেন, কে তাকে মাটি দেবে? তার জবাবে তাকে বললেন, "তুমি যাও তাকে মাটি দাও।" (ইমাম আহমাদ, নাসাঈ প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন।)

এরূপ কথা শুয়াইব (আঃ) এর দল সম্পর্কেও বলা যায়। যারা তাকে কাফিরদের আক্রমণ হতে প্রতিরোধ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর শত্রুদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন ঃ

যদি তোমার সাথে এ দলটি না থাকত তাহলে আমি তোমার উপর পাথর বর্ষণ করতাম। (হুদ ১১ঃ ৯১)

... যদিও তারা ছিল কাফির। তেমনিভাবে আল্লাহর নবী সালেহ (আঃ) এবং তাঁর সাথীদের কাফিররা ভয় দেখাতঃ

তারা বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ কর যে, রাতে তাকে ও তার পরিবারের উপর আক্রমণ করব এবং পরে তার অলীকে বলব তার পরিবারের ধ্বংস হওয়ার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না। আর আমরা সত্য কথা বলছি। (আন্-নাম্‌ল ২৭ঃ ৪৯)

- এর সাথে আরো একটি বিষয় যোগ করুন। এখানে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে যা পর্যালোচনা দরকার। তা হলো, মুসলিমকে কাফিরের আশ্রয় দেওয়া, সহযোগিতা করা, বিপদ থেকে রক্ষা করা, যা কাফির নিজের গরজেই করে থাকে, যা মুসলিম নিজেকে ছোট করে তার নিকট চায়নি। বরং এ কাজ কাফির করে থাকে আত্মীয়তা, স্বজনপ্রীতি অথবা অন্য কোন কারণে। এবং এ অবস্থার মাঝে মুসলিম নিজে কাফিরের কাছে তা চাইবে। তার এ চাওয়া এক প্রকার লজ্জা ও অপমান, চাটুকারিতা অথবা স্বীকার করা অথবা তার বাতিল সম্পর্কে নিরবতা পালন করা অথবা তার শিরকী কাজকে সমর্থন করার শামীল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ অবস্থা দু'টির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে। যা কোন জ্ঞানীর ও দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নয়। যদি উদাহরণগুলো নিয়ে গবেষণা করতেন তাহলে দেখতেন এগুলো প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত আবু জাফর তাহাবী মুশকিলুল আসারে (৩/২৩৯) সুক্ষ্মভাবে এ বক্তব্যের মতই আলোচনা করেছেন। তিনি পার্থক্য করেছেন যুদ্ধের সময় মুশরিকদের সাহায্য কামনা করার ও যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন তার মাঝে ঃ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের স্বজাতী ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। (আলি-'ইমরান ৩ঃ ১১৮)

... এবং মুসলমান কর্তৃক সাহায্য না চাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের স্বউদ্যোগে যুদ্ধ করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন, ইবন দুগনাহ কর্তৃক আবূ বকর (রাঃ)-কে আশ্রয় দেওয়া, পূর্বে উল্লেখিত সবই এ ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত।

এরই মধ্যে শামীল হচ্ছে মুশরিক পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা, তাদের মনোতুষ্টি করার কেননা তারা তাদের ছেলে কর্তৃক প্রভাবিত, যে সত্যের দিকে আহ্বান করে তার অনুসরণ করার আশা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা পর্যন্ত বাকিই থেকে যায়। এমনকি তারা উভয়েই তাকে শিরক করানোর চেষ্টা করেন।

যতক্ষণ না তারা তাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরানোর জন্য বিরোধী কাতারে না দাঁড়ান, যদি তারা এ কাজ করেন তাহলে তাদের থেকে প্রকাশ্যেই আলাদা হয়ে যাবে, যেমনি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কাছে যখন স্পষ্ট হয়েছিল তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন তখন তিনি আলাদা হয়ে গিয়েছেন। শুধু আলাদাই হবে না বরং তাদের সাথে শত্রুতা ও যুদ্ধ করবে যেমনটি আবূ উবাইদা ও অন্যান্য সাহাবীগণ বদর যুদ্ধে করেছিলেন। আর ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার মন যোগানোর জন্য তাকে সুন্দর ও নম্রভাবে দাওয়াত দিতেন এবং তার হিদায়াত লাভের আশা প্রকাশ করতেন, শাইতানের বন্ধু হওয়ার কারণে তাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তার ভয়ও করতেন, তবুও তিনি তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন যখন আল্লাহর বিরুদ্ধে তার শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে আদর্শ গ্রহণ করার যে আহ্বান করেছেন সেখানে আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম কর্তৃক তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি বাদ দিতে বলেছেন।

আল্লাহ সূরা আত্-তাওবাতে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন যদিও তারা নিকট আত্মীয় হয়, এরপর ইব্‌রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

আর ইব্‌রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন শূধু সেই প্রতিশ্রুতির কারণে যা তিনি তাঁর সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (আত্-তাওবাহ্ ৯ঃ ১১৪)

এ ব্যাপারেই আল্লাহর বাণী ঃ

উত্তম কোন বিষয় ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক কর না...

এরপর এরও সতন্ত্র অবস্থা ও ঘোষণা করেছেনঃ

...তবে যারা জালিম তাদের সাথে করা যাবে ... (আল-আনকাবুত ২৯ঃ ৪৬)

তেমনিভাবে নাজ্জাশী কর্তৃক মুহাজিরদের নিরাপত্তা প্রদান। জাফর বিন আবূ তালিবের ঘটনা পড়ে দেখুন, তার দ্বীনকে প্রচার ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তার আকীদা প্রকাশে তার দৃঢ় স্থান এমন এক দ্বীনের লোকদের সামনে যারা তার বিপরীত আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। নিজের ও তাঁর সাথীদের অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও। তাদের নিরাপত্তায় প্রবেশ করার পরও। বরং নাজ্জাশীর নিকট পঠিত আল্লাহর বাণী শোনার পর নাজ্জাশী কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি সে কথা শুনে সমর্থন ব্যক্ত করে মুসলমানদের গ্রহণ করে নিয়ে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তারা সবাই তাদের দ্বীন ও আকীদা অন্যান্যদের নিকট প্রকাশ করেছেন। তাই নাজ্জাশী ও হাবশার যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তা মূলত আল্লাহর তাওফিক্ব ও সাহাবীদের (রাঃ) নিজস্ব দ্বীন ও আকীদা প্রচার প্রকাশ করার দ্বারাই। এ সংশয় নিরশন করতে পড়ুন ঃ শাঈখ আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুক) এর লেখা *আল-মাওরিদ আল-'আছাব আয-যালাল* প্রবন্ধটির পৃষ্ঠা ১২৪, তেমনি ঐ খণ্ডেরই পৃষ্ঠা ১৯৭, কেননা এ সংশয় নিরসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপর সংশয় (যার নিরসন করাও গুরুত্বপূর্ণ তা) হচ্ছে তারা দলীল হিসাবে ব্যবহার করে 'ফেরাউনের পরিবার থেকে যারা ঈমানদার'। (পৃষ্ঠা ২১২ দেখুন)

- এ সবের মূল কথা হলো, বাতিলপন্থীদের সাথে শত্রুতা, তাদের সাথে ও তাদের বানোয়াট প্রভুদের বাতিল দ্বীনের ও অসাধু আইনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা একটি বড় মূলনীতি ও নবী রাসূলদের দাওয়াতী কাজের শক্ত খুঁটি। ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, শরয়ী বিধান তথা আইন কানুন ইসলাম দ্বীনের মূলনীতি ও বিধিমালার উপর নির্ভর করে প্রমাণিত হয়। যদি পৃথিবীবাসী সকলে একে প্রতিহত/বাতিল করতে একত্রিত হয় তবুও কিছুই করতে পারবে না। আর বিরোধীরা এতে প্রমাণ খাড়া করতে পারবে না যেমনটি আপনি দেখেছেন। এই নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত, যা সকল উসূলবীদ ও পর্যবেক্ষকদের নিকটে মোটেই ব্যপক নয়। বরং এগুলো স্ব স্ব বিষয়ে সীমাবদ্ধভাবে অনুসরণীয় এবং যখন প্রমাণিত হবে এই পদ্ধতি একটি মুহকাম মূলনীতি তাহলে এ খণ্ড দলীলের দাবী বিরোধীরা যে এর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন মোতাশাবেহ হওয়ার প্রত্যাখ্যান করা, কুরআনের কতক অংশের সাথে বা রাসূল (সঃ)-এর হাদীসের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরী করা ঠিক নয়। তাই সাবধান থাকুন আর সন্দীহানদের সন্দেহে পড়ে প্রতারিত হবেন না।

এমনিভাবে দা'য়ীরা নিজ জাতির সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করবে যেদিন, সেই দিন এ পৃথকীকরণ পূর্ণ হবে এবং আল্লাহর ওলীদের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহর দিকে দাওয়াতী ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে ইতিহাসের এ পর্যন্ত আলোচনা করে দেখা যায়, আল্লাহ তাঁর অলী (বন্ধু) ও শত্রুদের আলাদা করেননি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওলীদেরকে আলাদা আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত না করেছেন এবং তারা একমাত্র আল্লাহকেই তাদের রব হিসাবে না মেনে নিয়েছেন। আর দা'য়ীদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাদের উচিত অন্তরকে বিশ্বাসে ভরে নেওয়া এবং সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা, তাহলে ত্বগুত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হ্যাঁ আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা ব্যতিত এটা আল্লাহ তাঁর অলীদের সাহায্য করতে পারার অপারগতার কারণে নয় এবং তাদেরকে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্যও নয়। কিন্তু এ পরীক্ষা করেন অন্তর ও দলকে বিশুদ্ধ করার জন্য। এরপর মু'মিনদের পালা ফিরে আসে এবং মু'মিনদের দেওয়া সাহায্য ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেন।

পরিশেষে জেনে রাখুন, এ হকের সাথে জড়িত মানুষ কয়েক প্রকার ঃ

- মিল্লাতে ইব্‌রাহীম ও সকল রাসূলদের দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারক ব্যক্তি পূর্বে উল্লেখিত রূপের। সে এজন্য কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। তাহলে এ ব্যক্তি হচ্ছে প্রকাশ্য ও বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত (*আত-তা'য়িফা আল-মানসূরাহ*)। সে হচ্ছে এমন সত্যের আহ্বায়ক, যে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধরেন এবং সেই ইহ ও পরকালে সাফল্য অর্জন করবে। যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

তার কথার চাইতে কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ কাজ করে এবং বলে আমি মুসলিম। (ফুস্‌সিলাত ৪১ঃ ৩৩)

এর অর্থ হাদীসে রয়েছে ঃ “যে মু'মিন মানুষের সাথে মিশে ও তাদের অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতিতে ধৈর্য্য ধারণ করে সে উত্তম...”

তাকে তো অনিষ্ট পেয়ে বসবেই কেননা সে এমন কিছু সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছে যা সকল রাসূল উপস্থাপন করেছিলেন। সে বাতিলপন্থীদের সাথে ছাড় দিয়ে কথা বলে না। তাদের উপর নির্ভর করে না ও তাদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে। পদবি, চাকুরি, কাজ, পদ্ধতি যা তাদের বাতিলকে সাহায্য করে তা পরিত্যাগ করে। যার অবস্থা এমন হবে তাকে তাদের সমাজে, বাড়িতে বসবাস করা অপরাধ মনে করবে না এবং যে কোন দেশে হিজরত করা ওয়াজিব করবে না। শাঈখ হামদ বিন আতীক কুরআনের আগত আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে ... (মুমতাহিনা ৬০ঃ ৪)

... প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হয়ে গেল ... অর্থাৎ যারা আল্লাহর একাত্ববাদকে স্বীকার না করবে তাদের বিরুদ্ধে বিরতিহীন শত্রুতা ও ঘৃণার শুরু হলো। আর যে ব্যক্তি আদর্শকে জ্ঞানে, কাজে ও প্রকাশ্যে বাস্তবায়ন করবে আর তার দেশের লোক তা জানতে পারবে আর তাকে কোন দেশে হিজরত করতে হবে না। আর যে এ রকম না হবে, বরং এ চিন্তা করবে যে তাকে যখন সালাত, সিয়াম, হাজ্জ করার সুযোগ দিয়েই রেখেছে তাই তার হিজরতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে। এ ধরনের ধারণা প্রমাণ করে দ্বীন সম্পর্কে তার অজ্ঞতা ও রাসূলদের রিসালাতের সারমর্ম উপলব্ধিতে তার গাফলতি ছাড়া আর কিছুই না। (১৯৯ পৃষ্ঠা জিহাদ খণ্ড) এবং এ প্রকারের মানুষ যখন তার হক্বকে প্রকাশ করলে হত্যা বা শাস্তির হুমকি দেওয়া হয় এবং হিজরত করার মত তেমন কোন দেশও না পান তাহলে তার জন্য কাহাফবাসীর পালনীয় আদর্শ যারা দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য পাহাড়ে পালিয়েছিল। অপর আরেকটি আদর্শ, রয়েছে উখদুদবাসীদের মধ্যে, যারা তাদের আকীদা ও তাওহীদের জন্য অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন, যারা দুর্বল হননি ও নতিও স্বীকার করেননি। অপর আদর্শ রয়েছে রাসূল (সঃ) সাহাবীদের মধ্যে যারা হিজরত করেছেন, জিহাদ, যুদ্ধ, হত্যা করেছেন ও নিহত হয়েছেন। আপনাকে হিদায়াত ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

- অথবা এমন লোক যে শুরু থেকেই কম প্রভাবশালী এবং বিপদাপদে পূর্ণ। এ দ্বীন এভাবে সে পালন করতে পারবে না এবং সে প্রকাশ্যে এ কাজ করলে হয়তো দ্বীনের কাজ করতেই পারবে না। সে ভয় পায় এবং প্রচার করতে পারে না তাহলে সে তার ছাগলের সাথে পাহাড়ের পাদদেশে চলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাবে ফিতনার ভয়ে।

- অথবা এমন অক্ষম ব্যক্তি যাকে তার বাড়ী আটকে রেখেছে বিশেষ কাজের জন্য। যিনি তার বাকী সদস্যকে শিরক, মুশরিক এবং আগুন থেকে- যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, সেখান থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। সে কাফিরদের সংস্রব থেকে দূরে থাকবে ও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাদের বাতিলের প্রতি সন্তুষ্ট প্রকাশ করবে না এবং যে কোন ভাবেই হোক না কেন সহযোগিতা করবে না। অবশ্যই এক্ষেত্রে তার তাওহীদকে নিরাপদ রাখতে হবে। তার অন্তর শিরক ও মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকবে এবং অপেক্ষায় থাকবে প্রতিবন্ধকতা দূর হবার এবং দ্বীন নিয়ে পালানোর ফাঁক খুঁজবে এবং এর চেয়ে কম ঝুঁকি ও বিপদ যেখানে সে দেশে হিজরত করার সুযোগ খুঁজবে যেখানে সে তার দ্বীনকে প্রকাশ করতে পারবে। মুহাজিরদের হাবশাতে হিজরত করার মত।

- অথবা এমন লোক, যে বাতিলপন্থীদের প্রতি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তাদের বানোয়াট ও গোমরাহীর সমর্থন করে। তাহলে এ ধরনের লোকের তিনটি অবস্থা, যা শাঈখ হামদ বিন আতীক ...... গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

প্রথম অবস্থা ঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে উভয়ভাবে তাদের সমর্থন করে। তাহলে এ ধরনের ব্যক্তি কাফের ও ইসলাম হতে বহিষ্কৃত। চাই এতে সে অপছন্দকারী হোক বা না হোক যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ **... যে ব্যক্তি কুফরীতে নিজের বক্ষ প্রসার করবে তার উপর আল্লাহর গযব ও মহা শাস্তি দেওয়া হবে।** (আন্‌-নাহল ১৬ঃ ১০৬)

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ গোপনে তাদের সাথে মিশে ও সমর্থন করে। আর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে, তাহলে এ লোকও কাফির এবং এরা মুনাফিক।

তৃতীয় অবস্থা ঃ গোপনে তাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে। এ লোক আবার দু'ধরনের। (১) সে এ কাজ করে তাদের রাষ্ট্রে অবস্থানের কারণে, মারধর করার ও বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি তা না করলে হত্যার হুমকি দেয়। তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার জন্য সে কাজ করা জায়েয শুধু প্রকাশ্যে তাদের সাদৃশ্যতা বজায় রাখার জন্য, তবে তার অন্তর ঈমানে পূর্ণ অটল থাকে যেমনটি আম্মার (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ **শুধু সে ব্যতিত যদি কাউকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে ...** (আন্‌-নাহল ১৬ঃ ১০৬)

আমি মনে করি, এ ধরনের লোকদের সর্বদা অক্ষম (দুর্বল) লোকদের মত চেষ্টা করা উচিত। যেমন নবী (সঃ)-এর দুর্বল সাহাবীরা সর্বদা দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন এবং দু'আ করতেনঃ

হে আমাদের রব! অত্যাচারি অধিবাসীর ভূমি হতে আমাদের বের করে নাও। আমাদের জন্য একজন অভিভাবক পাঠাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্য মঞ্জুর কর। (আন্‌-নিসা ৪ঃ ৭৫)

এতপর তিনি (হামদ বিন আতীক) বলেন ঃ আর দ্বিতীয় অবস্থা হল যে গোপনে তাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে আর সে তাদের রাষ্ট্রের নাগরিক নয় । তাকে এ কাজে প্রভাবিত করেছে নেতৃত্বের লোভ, সম্পদ, কোন দেশের নাগরিকত্বের লাভের আশায়, পরিবার অথবা এর কারণে সম্পদে যে ক্ষতি হতে পারে সে আশঙ্কায় । সে এই অবস্থায় মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) হয়ে যাবে । গোপনে তাদের কাজকে অপছন্দ করা তার কোন কাজে আসবে না । সে এমন ব্যক্তি যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ **তারা এমন লোক, যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে ভালবাসে । আর আল্লাহ কাফিরদের হিদায়াত করেন না** । (আন্‌-নাহল ১৬ঃ ১০৭)

তিনি বলেছেন, তিনি কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতা ও ঘৃণা করাকে বা সম্পদের মোহকে দা'য়ী করেননি বরং মূল কারণ হলো তাদের দুনিয়ার অংশের একটি অংশ তারা বেছে নিয়েছে এবং তাকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে । শাঈখ বলেছেন, এটাই হচ্ছে শাঈখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের (রহঃ) কথার অর্থ ।

- আমি বলি ঃ শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের কথার অর্থ যেদিকে ইবন আতীক ইঙ্গিত করেছেন তাঁর পুস্তিকা ও গ্রন্থে বহু স্থানেই আছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, '*মাজমু'আত আর-রিসায়িল আন-নাজদীয়া*' গ্রন্থের ৪২ নং পৃষ্ঠা আছে ঃ

"জেনে রাখুন, সৎ মুসলিমকে কাফির বলার প্রমাণাদি যখন সে আল্লাহর সাথে শিরক করবে, অথবা তাওহীদপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকদের সাথে উঠাবসা করা সমর্থন করে, তবে শিরক করে না । তার ব্যাপারে আল্লাহর কালামে ও হাদীসে রাসূলে এবং আলেমদের বক্তব্যে এতো বেশী এসেছে যেগুলো শেষ করা সম্ভব নয় । আমি আপনাদের কাছে আল্লাহর বাণীর একটি আয়াত উল্লেখ করেছি যার তাফসীর সম্পর্কে সমস্ত তাফসীরবিদ ঐক্যমত পোষণ করেছেন । আর সে ব্যাপারটি মুসলিমের মধ্যেই যদি কোন লোক বলে তাহলে সে কাফির হবে, চাই যে যুগেই হোক না কেন । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে ...[২৬] তাতে উল্লেখ আছে, তারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করেছিল । আলেমরা সাহাবীদের ওপর নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের কথা বলেছেন । যেহেতু মক্কাবাসী তাদেরকে জ্বালাতন করত তারা আরও উল্লেখ করেছেন, যদি কোন সাহাবী শিরকের প্রতি ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও নিজ মুখে শিরকী কথা উচ্চারণ করত, তাদের সাথে শত্রুতা করার পরও যদি ভয়ে বলত, তাহলে তারা ঈমানদার হওয়ার পরও কাফির হয়ে যেতো ।"

এ কথাটি শাঈখ হামদ বিন আতীকের পূর্বে উল্লেখিত ও সামনে শাঈখ সোলাইমানের বক্তব্যের সহিত মিল আছে । সেটি আরো ভয়াবহ কথা । আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানি, সেটা যদি আমাদের কথা হতো এবং এই বিজ্ঞ ইমামের কথা না হতো তাহলে তাকে বলা হতো ঃ খারেজী ও কুফরী । যদিও আয়াতটি স্পষ্ট দলিল । এ বিষয়টি মাকরূহ থেকে ভিন্ন কুফরী শব্দ প্রয়োগ করলে প্রয়োগীত ব্যক্তি আপত্তি করে । তবে আমরা এখানে এমন কতক লোকের কথা বলব, যাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করা হয়নি, মারা বা শাস্তি দেওয়া হয়নি মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যতা বন্ধুত্ব প্রকাশের জন্য ।

---

[২৬] আন্‌-নাহল ১৬ঃ ১০৬

পার্থিব জীবনের মোহ, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়, সম্পদের,লোভ ও নাগরিকত্ব লাভের আশা তাদের এ কাজ করতে প্ররোচিত করে তাদের কাছে পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের চাইতে বেশী প্রিয়। দ্বীন, তাওহীদ ও আকীদার বিনিময়ে তারা পার্থিব জীবনের নশ্বর তৈজসপত্র কিনে। কখনো তারা এ কথা বলে আড়াল করতে চায় যে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তারা প্রয়োজনীয়তার দাবী তুলে অথচ বাস্তবে তা মোটেই এমন ছিল না। এ জন্য তার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বকে নিষেধ ও প্রকৃত বাধ্য করা ব্যক্তির জন্য বৈধতা দেওয়ার পর আল্লাহ সূরা আলি-'ইমরানে ভয় দেখিয়ে বলেছেন,

.

আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের সতর্ক করেছেন। আল্লাহর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। হে নবী (সঃ) আপনি বলে দিন, তোমাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ কর আর গোপন কর আল্লাহ তা জানেন... । (আলি-'ইমরান ৩ঃ ২৮-২৯)

ঠিক পরবর্তি আয়াতেই আল্লাহ সরাসরি বলেছেনঃ

যেদিন প্রত্যেকেই যা ভাল আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং যে খারাপ কাজ তাও। (খারাপ কাজ উপস্থিত) দেখে তারা আশা করবে যদি তার ও এর মাঝে বিশাল দূরত্ব থাকত। আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। (আলি-'ইমরান ৩ঃ ৩০)

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব নিয়ে গবেষণা করে ও বুঝে এটা যে বড় হুমকি ও ধমকি সে তা বুঝতে পারবে। তবে আল্লাহ যাকে ফিতনাতে রাখতে চায় সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন উপকারই পায় না। এ কাজ করবে যাদের আখিরাতে কোন সৎ আমল থাকবে না তারা, তারা অপরাগতার কথা বলে আর্জি করবে। তবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আলেমগণ অপারগতা প্রকাশ যাথাযথ হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো ঃ

১) বাধ্যকারী তাকে যে হুমকি দেয় তা করার সামর্থবান হওয়া। আর যাকে হুমকি দেওয়া হয় সে পালিয়ে গিয়েও তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম।

২) তার ধারণার মাত্রা এমন হতে হবে, যদি সে হুমকি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার উপর হুমকির কাজ বাস্তবায়িত হবে।

৩) তাকে যা দিয়ে হুমকি দেওয়া হবে তা তাৎক্ষণিক উপস্থিত থাকতে হবে। যদি বলে তুমি এরূপ না করলে আগামীকাল তোমাকে মারব। তাহলে তাকে অপারগ বলে গণ্য করা হবে না।

৪) আদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যেন বাড়াবাড়ি প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ যেটুকু বললে বা করলে তার বিপদ (হুমকি) দূর হবে তার চাইতে বেশি কিছু করা।

- যেমন যা দ্বারা অপারগকে হুমকি দেওয়া হয়, ভয় দেখানো হয়, পাপ কাজ করতে বাধ্য করা হয়, ও কুফরী কথা বলতে বা কাফেরদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয় অনুরূপ বিষয়ের মধ্যের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। একমাত্র যাকে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় যা সহ্য করা সম্ভব নয় সে ব্যতিত কারো জন্য দ্বিতীয়টি করা বৈধ নয়। শাস্তির মধ্যে হত্যা করা, অগ্নিদগ্ধ করা, অঙ্গহানী অথবা যাবত জীবন কারাদণ্ডের কথা বলেছেন। আম্মার (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে আত্মরক্ষার আয়াত নাযিল হয়েছে। এ কথা সবারই জানা যে, তারা যা বলেছিল তিনি তা বলেননি অবশ্য তার মাতাপিতার হত্যাযজ্ঞ দেখার পরে এবং বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ভোগ করার পর। তার পাজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আল্লাহর জন্য তিনি কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন। আত্মরক্ষার এই অভিযোগকারীর অধিকাংশই ফিতনায় পতিত হয়েছে বাতিল ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। তিনি যতটুকু পেয়েছেন তার তুলনায় তারা একদশমাংশও সুবিধা পাবে না কিন্তু তাদের অবস্থা যা পূর্বে বর্ণনা করেছি- আল্লাহ যার থেকে ফিতনা চান সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সুযোগই পায় না।

এর সাথে এ কথাও যোগ করুন- জ্ঞানী সম্প্রদায় কুফরী শব্দ বলতে বাধ্য করা অধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন, শক্তভাবে তাওহীদকে আঁকড়ে থাকা, কষ্টে ধৈর্য্য ধরা, আল্লাহর কাছে এর পুরস্কারের আশা করা মহত্তের কাজ ও উত্তম। এটিই ছিল সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামদের অবস্থান ও আদর্শ। এ ধরনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দ্বীন প্রকাশ লাভ করে ও এর মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ফুটে উঠে।

দেখুন সহীহ্ বুখারীর অনুচ্ছেদ- "যে ব্যক্তি প্রহার, হত্যা ও অপমানকে কুফরীর উপর বেছে নেয়"। এর প্রমাণও ভুরিভুরি। তেমনিভাবে ইমামদের অবস্থান যা হিসাব করা সম্ভব নয়। যেমন ইমাম আহমাদের কুরআন সৃষ্টি ফিতনায় দৃঢ় অবস্থান ও অন্যান্য প্রমুখ।

তারা আল্লাহর এ কথা উল্লেখ করেন ঃ

আর মানুষের মধ্যে কতক আছে যারা বলে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। যখন আল্লাহর কাজ করাতে কষ্টে পড়ে তখন মানুষের ফিতনা (বিশৃংখলা ও শাস্তি)-কে আল্লাহর শাস্তি মনে করে... (আল-আনকাবুত ২৯ঃ ১০)

যেমন তারা উল্লেখ করেছেন, (কুফরী ও তাওহীদের মধ্যে) বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া অপারগতার পরিপন্থী। এটি হচ্ছে শুয়াইব (আঃ)-এর অবস্থার মত। যখন তারা তাকে কুফরীতে ফিরে আসা অথবা গ্রাম হতে বের হয়ে যাওয়ার দুটির একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল তখন তারা প্রথম প্রস্তাবকে গ্রহণ করা বৈধ বলেননি যে তিনি এ পরিস্থিতিতে কুফরী করতে পারেন। আমরা এগুলো বিস্তারিত এ জন্যই আলোচনা করেছি যাতে করে আল্লাহ যাকে বুদ্ধি ও বুঝ শক্তির নিয়ামাত দান করেছেন তারা যেন বুঝতে পারেন। আমাদের যুদ্ধে এমন লোকের সংখ্যা কম যারা এ দ্বীনের তাওহীদকে বুঝে এবং সে দিকে দাওয়াত দেয়। আজকে অধিকাংশ মানুষ রাষ্ট্রীয় ও ত্বগুতী ধর্মে ঢুকেছে, সত্যিকার কোন চাপ ছাড়াই তা বেছে নিয়েছে, তারা এ কাজ করে পার্থিব

জীবনকে অগ্রাধিকার এবং পার্থিব সম্পদ, বাড়ী আসবাব ও দ্বীন বিরোধী পদবী ও চাকুরী পাওয়ার জন্য। তারা তাওহীদ ও ঈমানকে খরচ ও বিক্রি করেছে নিকৃষ্ট বস্তু ক্রয়ে। তাই আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। যদি হন তাহলে আপনি লজ্জিতদের কাতারে শামীল হবেন।

- এ বক্তব্য ও অনুরূপ বিষয়গুলো ইবন আতীক গোপনে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে এবং সে তাদের অধিনেও থাকে বরং পূর্বে উল্লেখিত পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার জন্য এ কাজ করার কারণে তাদের কাফির বলাতে অনেক লোক সে আপত্তি ও খারাপ মনে করেছিল তাদের সে অবস্থা দূর হবে এবং তা অপারগতা বলে গণ্য হবে না। তার ভাষায় ঃ "গোপনে তাদের সাথে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও।" এর দ্বারাই তিনি উদ্দেশ্য করেছেন আল্লাহই ভাল জানেন (তার ধারণা মতে) এ ছাড়া আমরা এ অবস্থায় তার প্রকৃত গোপন অবস্থা কিভাবে জানব। যা ওয়াহী ছাড়া জানা সম্ভব নয়। যেমন ঘটেছিল হাতিব বিন আবূ বালতার ঘটনাতে আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গোপন বিষয়ের দায়িত্ব দেননি বরং আমরা প্রকাশ্য অবস্থা থেকে বিচার করব।

যেমনি আমরা আমাদের তলোয়ার উঠাই না ঐ সমস্ত লোকের উপর যারা অন্তরে নিফাক গোপন রেখে বাহ্যিকে ইসলামের সাথে ভাল সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং তার আলামত প্রকাশ করে ঠিক তেমনিভাবে আমরা তলোয়ার চালাবো ঐ ব্যক্তির উপর যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ, সমর্থন ও তাদের সাথে জোটবদ্ধ হবে। যদিও মনে করে যে, সে গোপনে ইসলাম মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে আমাদেরকে প্রকাশ্য বিষয় দেখে বিচার করার দায়িত্ব দিয়েছেন আর সমস্ত গোপন বিষয়ের দায়িত্ব তিনি একাই নিয়েছেন। তিনি কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা জানেন। মানুষকে কাজ অনুযায়ী হিসাব নেওয়া হবে আর তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।

যেমন বুখারী মুসলিমের ঐক্যমত হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা থেকে বর্ণিত হয়েছে ঐ সৈন্য দল সম্পর্কে যাকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে তাতে বিচক্ষণ ও অক্ষম লোক থাকা সত্ত্বেও। দুনিয়াতে আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিবেন। আর কিয়ামাতের দিন তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী পুনরুত্থান করে বিচার ফায়সালা করবেন, এটিই ওমর (রাঃ)-এর কথার অর্থ। যেমন বুখারীতে এসেছে ঃ "মানুষকে রাসূল (সঃ)-এর সময়ে ওয়াহী গ্রহণ করতে দেওয়া হতো, যারা আমাদের সাথে ভাল অবস্থা প্রকাশ করত তাদেরকে আমরা নিরাপত্তা দিতাম ও সান্নিধ্য দিতাম। তার কোন গোপন বিষয়ে আমরা খোঁজ নিতাম না। আল্লাহই তার গোপন বিষয়ের হিসাব নিবেন। আর আমাদের সাথে যে খারাপ ব্যবহার করত তাকে নিরাপত্তা দিতাম না ও বিশ্বাসও করতাম না, যদিও বলত তার গোপন অবস্থা ভাল । "যুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে নবী (সঃ) মানুষের সাথে এ পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করতেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' (৮৮, ৮৯, ৯১/ ৬) এবং 'মুশকিলুল আসার' (পৃঃ ২৪২-২৪৬/৪) ও অন্যান্য গ্রন্থে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের উদাহরণ দেখতে পারেন। যদিও তিনি মুসলমান বলে দাবী করেন তবু বদর যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসলে তার সাথে অন্য কাফেরদের মত আচরণ করেছিলেন। কারণ হলো, তিনি তখন পর্যন্ত কাফের এলাকা মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র মদিনাতে হিজরত করেননি। সেজন্য বাধ্যতামুলক ভাবে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য কাফেরদের সাথে বের হন। আর মুসলিম বাহিনী

তাকে বন্দি করেন তার সাথে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল তার গোপন ইসলামী ধ্যান ধারণা ও দাবীর ভিত্তিতে নয়। কেননা তিনি মুশরিকদের দলের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য তার দলে বের হয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, তিনি তাদের সাথে বের হতে বাধ্য ছিলেন। যা কিছু আসার (হাদীস) ইঙ্গিত দেয়, যা এখন উল্লেখ করা হলো ঃ কতক আসার আছে ঃ যখন আব্বাসকে (রা) ইসলামের দাবী ও অপারগতার কথা বলে অভিযোগ করতে দেখলেন তখন রাসূল (সঃ) বললেন ঃ "আল্লাহ তোমার অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন। তুমি যা দাবী কর তা যদি সত্যি হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন। আর তোমার বাহ্যিক অবস্থা আমাদের কাছে একজন যুদ্ধ বন্দি তাই মুক্তিপণ আদায় কর।" এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। তবে এতে একজন বর্ণনাকারী আছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। সঠিক বিচারে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে যে কথা বর্ণিত আছে সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। নবী (সঃ) তার (আব্বাসের) সাথে বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা করেছেন। অন্যান্য মুশরিক বন্দিদের মত মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেননি। সম্ভবত এরই অর্ন্তভুক্ত হবে সহীহ্ মুসলিমে ইমরান বিন হুসাইন বর্ণিত হাদীস বনী আকীল গোত্রের জনৈক লোক ঐরূপ দাবী করলেও তাকে নবী (সঃ) ছাড়েননি। (দেখুন - মুখতাসার মুনযিরী, নম্বর ১০০৮)

এ সকল আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আমরা লেনদেন ও বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে কেবল বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনার দায়িত্ব পেয়েছি গোপন অবস্থার নয়। আর এটি হচ্ছে আমাদের উপর আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। এ রকম না হলে প্রত্যেক গুপ্তচর বদমাস ও *যিনদীক* (দ্বীনত্যাগী) হতে ইসলাম ও মুসলমানদের কত হাস্যকর ও বিব্রত অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো।

এ আলোচনারই অংশ হাতেব বিন আবু বালতায়ার ও মক্কা বিজয়ের বছরের ঘটনা। তখন তিনি যা করেছিলেন তার মূল কথা হলো, যে কুফরীর মত কাজ করবে তার বাহ্যিক অবস্থার উপরই নির্দেশ জারি করা হবে। দুনিয়াতে বিচার ফায়সালা করাকে যেমন হত্যা করা বা বন্দি করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের বাহ্যিক দিকেই লক্ষ্য রাখা জরুরী। যে মুরতাদের অবস্থা, প্রকার, তাদের কতক দলীল ও যুক্তি, মুসায়লামার নবুয়্যতের সাক্ষ্য দিয়ে ধোঁকা দেওয়ার দলিল এবং সুমামা ও ইয়াশফুরীর ঘটনা সহ আরো অনেক ঘটনা। ব্যাপারটি যদি এমন না হতো তাহলে আবু বকর এদের সবার সাথে কিভাবে এ ধরনের ব্যবহার করেছেন বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে, তিনি তাদের ব্যাপারে হত্যা ও বন্দির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল আবূ বকর সিদ্দীকের সবচেয়ে বড় সম্মানের মর্যাদার ভাল কাজগুলোর একটি। আমরা যে উদ্দেশ্য ও যেদিকে ইঙ্গিত করতেছি তার বিশুদ্ধতা জানা গেল। এ ব্যাপারে আরো বেশি জানতে হলে শাঈখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের বক্তব্য পড়তে পারেন। এ অধ্যায়ে এটুকু অনেক। দেখুন উদাহরণ স্বরূপ 'মুকাদ্দমাতুস্ সীরাহ্' উল্লিখিত ছয়টি স্থানের উল্লেখ করেছেন এবং হাতিবের ঘটনায় উমার যে বুঝটি নবী (সঃ) এর উপস্থিতিতে ব্যক্ত করেছিলেন সেটিকে তিনি অস্বীকার করেননি। সেটিই পূনার্ঙ্গ কথা। তাকে কিন্তু রাসূল (সঃ) একথা বলেননি, "যে তার ভাইকে 'হে কাফের' বলবে তখন দুজনের যে কোন একজন এ শব্দের বাহক হবে।" বরং উমারের (রা) হুকুমকে তিনি সমর্থন করেছেন। হাতিবের মত যার কোন প্রতিবন্দকতা নেই তার ব্যাপারে উমার (রা) এর হুকুমকে বাদ দেননি। তিনিই আমাদেরকে হাতিবের গোপনীয় পবিত্রতার কথা বলে

দিয়েছেন তার ভাষায় "তোমাকে কে জানাল যে হয়তো আল্লাহ বদরবাসীর সম্পর্কে অবগত হয়েছেন হাতিব (রা) বলেছিলেন যা বুখারীতে এসেছে "আমি এ কাজ কুফরী, মুরতাদ বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে করিনি। তখন রাসূল (সঃ) তার অবস্থার সঠিক বলে বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তৎক্ষণাত হাতিব কর্তৃক এ ধরণের কথা বলাই স্পষ্ট দলিল যে সাহাবীগণ ও তিনি জানতেন এ ধরনের কাজ করা কুফরী ও দ্বীনত্যাগ করার নামান্তর।

আহমাদ ও আবু ইয়ালার বর্ণনায় এসেছে "আমি এ কাজ রাসূল (সঃ) কে ধোঁকা দেওয়ার জন্য করিনি বা মুনাফেকী বশতও নয়। আমি একথা জেনেই করেছি যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করবেন ও তাঁর নূরকে পূণার্ঙ্গ করবেন।"

তাদের অপর বর্ণনায় আছে ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আমার অন্তর থেকে ঈমান বিকৃত হয়ে যায় নি ....।" (দেখুন 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' ৩০৬/৯) এবং বুখারীতে বর্ণিত নবী (সঃ) এর কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখুন, "সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলেছে।"

এই বদরী সাহাবীকে নবী (সঃ) বিষেশায়িত ও নির্দোষ ঘোষণা করেছেন এবং তার গোপনীয় ও লুকানো সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সে একাজ সে কুফরী বা দ্বীনত্যাগ করার জন্য করেনি। বরং এটি ছিল তার কবীরা গুনাহ যা বদরী যোদ্ধা হওয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেছে। তাহলে বর্তমান যুগের কাফেরদের বন্ধুদের অবস্থা কি হতে পারে যারা হাতিবের কাহিনী নিয়ে মাতামাতি করে। তাহলে তাদের মধ্যে আজ পৃথিবীতে বদরী যোদ্ধা বেঁচে আছেন যার অন্তরের খবর সম্পর্কে আল্লাহ জানেন তাই একে কবীরাহ গুনাহ বলে গণ্য করবে। এজন্য লজ্জিত হবে এবং তা পরবর্তীতে এ অপরাধ শেষ হয়ে যাবে?

আমরা তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারি না যতক্ষণ না জানতে পারব তাদের গোপনীয় অবস্থা সত্য এবং তারা এ কাজ দ্বীনত্যাগ ও কুফরীর করার জন্য করেনি। ওহী বন্ধ হওয়ার পরও আমরা কি করে জানব যে, তার গোপন অবস্থা সত্য এবং রাসূলের পর কে নির্দোষিতার কথা বলবে ও সাক্ষ্য দিবে।

এটিই হচ্ছে অপ্রকাশ্য। কুফরী হওয়ার ক্ষেত্রে এটিই হলো প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে প্রকাশ্য অবস্থা এর বিপরীত। আর ওহী বন্ধ হওয়ার পর এর দায়িত্বও আমরা পায়নি। এজন্যই যে ব্যক্তি কাফিরের সাথে সামঞ্জস্যতা, বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে তার বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা তাকে কাফির ফতোয়া দিব। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে গোপন বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। যদি নিয়্যাত ভালই থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে পুনরুত্থানের পর পুরস্কৃত করবেন। যদিও তাকে মুসলিম বাহিনী কাফিরদের কাতারে হত্যা করে থাকে। এ ধরনের দাবীদার ব্যক্তিকে- যে গোপনে ইসলাম মানে ও মুসলমানদের সাথেই সম্পর্ক রাখে তাকে হত্যা করলেও মুসলিমরা নির্দোষ বলে গণ্য হবে।

এ সম্পর্কে শাঈখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার বক্তব্য ঐ সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে যারা কাবাতে যুদ্ধ করতে এসে ধ্বসে যায়, বদরযুদ্ধে আব্বাসের বন্দি হওয়া ও তার ইসলাম গ্রহণের দাবীর ঘটনা 'মাজমু'আহ আল-ফাতাওয়া' (২৮/৫৩৭) এবং তার শিষ্য আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এর 'যাদুল মাআদ' (৩/৪২২) এছাড়াও হক্কানী আলেমদের লেখনী পড়ুন।

আল্লাহর এ আয়াত নাযিলের শানে নুযূল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন ঃ

যাদেরকে ফেরেশতারা মেরে ফেলেছে তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল...
(আন্-নিসা ৪ঃ ৯৭)

এজন্য দেখুন সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থ। এগুলো নিয়ে গবেষণা করুন এবং চোখ থেকে ঘুমের ধুলি সরিয়ে দিন এবং অন্ধ অনুসারীদের মত চলবেন না।

- অবশেষে হাফিজ ইবন হাজার ফাতহুল বারীতে (৭/৫২১) কয়েকটি যুদ্ধের কথা বর্ণনা করে বলেছেন, এগুলো তাফসীরে ইয়াহইয়া বিন সাল্লামে আছে, হাতিবের চিঠির শব্দ ছিল ঃ অতঃপর হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিশ্চয় রাসূল (সঃ) সৈন্য বাহিনী নিয়ে তোমাদের আক্রমণ করতে আসছেন সে রাতের ন্যায় যে রাতে বন্যা ধেয়ে আসে। আল্লাহর শপথ! যদি তিনি একাই আসেন তাহলে আল্লাহর সাহায্য পাবেন ও তাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি বাস্তবায়ন করবেন। তোমরা তোমাদের বাঁচার পথ খুজো। তোমাদের প্রতি সালাম রইল।" সুহাইলী এরূপই বর্ণনা করেছেন।

আমি বলব ঃ যদি কোন বিবেকবান চিন্তা করেন তাহলে তার নিকট হাতিবের এ চিঠি ও চিঠিতে নবী (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস ও তার অবস্থানকে মর্যাদা ও বড় করে তুলে ধরার কথাই প্রতিয়মান হবে। এ সত্ত্বেও আল্লাহ তার এ কাজের জন্য এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন যা পড়ে ঈমানদারদের শরীর থর থর করে কেঁপে উঠে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানিও না তাদের প্রতি সহানুভূতি জানানোর জন্য। তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসূল ও তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য বের করে দেয়। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করতে বের হও এবং আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর তাহলে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর না। তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তা জানি তোমাদের মধ্যে যে এ কাজ করে সে সঠিক পথভ্রান্ত হয়ে পড়বে। (মুমতাহিনা ৬০ঃ ১)

যদি এটি চিন্তা করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দিবেন। কিভাবে এতে আল্লাহ কঠোরতা প্রকাশ করেছেন ও একে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগী বলে অভিহিত করেছেন। এরপর বর্তমানে ইসলামের অনেক দা'য়ীদের অবস্থার দিকে নজর দিন এবং তাদের মোবারকবাদ ও চাটুকারিতা বরং একে সাহায্য এবং মানবরচিত আইনকে সমর্থন আর শারীয়াতের ও তাওহীদের শত্রুদের অনুকরণ বলা চলে। তাদের সংবিধান, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সমর্থন ও মানবরচিত আইনের সম্মানার্থে শপথ করা সবই তাদের দ্বারা সংগঠিত হয়। পাঠক, আপনি ইতোপূর্বে জেনেছেন সঠিক দ্বীনের অনুসারী স্বল্প এবং একে ভালভাবে বুঝে এর সংখ্যা খুবই বিরল। তাই দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থাকুন।

শাঈখ হামদ বিন আতীক বলেছেন, ওযরের ধোয়া তুলে কতক মানুষ যে আকীদা পোষণ করে তা হচ্ছে শয়তানের কারসাজি ও প্ররোচনা। তাদের যখন শয়তানের ওলীরা ভয় দেখায় প্রকৃতভাবে নয় তখনই সে মনে করে তার জন্য মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যতা ও তাদের আনুগত্য করা বৈধ। অতঃপর কুফরী শব্দ বলতে বাধ্য হওয়ার বিবরণ সম্পর্কে শাঈখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাকে অথবা তার স্ত্রী, সম্পদ অথবা পরিবারকে মারধর, শাস্তি, হত্যা করার হুমকি ছাড়া শুধুমাত্র কথা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ভয় দেখানো হলে একে অপারগতা বলে গণ্য করা যাবে না। এরপর তিনি (রহঃ) বলেছেন, "যখন আপনি এগুলো শিখলেন তারপরও যখন অনেক মানুষকে এতে পতিত হওয়ার কথা জানতে পারবেন তখন আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে নবী (সঃ) এ কথার মমার্থ, 'ইসলাম সূচনা হয়েছিল অপরিচিত ভিনদেশীর মত আবার ইসলাম অপরিচিত হয়ে যাবে যেরূপ আরম্ভ হয়েছিল...।' যারা একে প্রকৃতভাবে বুঝবে তাদের সংখ্যা হবে একেবারেই নগণ্য। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনা করি।" (সাবিলুন নাজাত)

- শাঈখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব 'তাইসীরুল আযীযীল হামীদ' গ্রন্থের লেখক পুস্তিকার ভূমিকায় বলেন ঃ "জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করুন, মানুষ যখন মুশরিকদের ভয়ে তাদের দ্বীনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিবে, তাদের তোষামোদ করবে, তাদের অপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য চাটুকারিতা করবে সে তাদেরই মত কাফির। যদিও তাদের দ্বীনকে সে অপছন্দ করে, তাদের ঘৃণা করে, ইসলাম ও মুসলিমদের ভালবাসে।"

  এরপর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেছেন যা মুশরিকদেরকে মাল দ্বারা সাহায্য, সমর্থন ও মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার চাইতেও মারাত্মক। এ পর্যন্ত তিনি বলেছেন, এর আওতার বাইরে অপারগ ব্যতিত আর কেউ বাদ যাবে না। সে এমন ব্যক্তি যার উপর মুশরিকরা প্রবল চাপ প্রয়োগ করে, তারা তাকে বলে, কুফরী কর অথবা এরূপ কর যদি না কর তাহলে তোমাকে আমরা হত্যা করব অথবা তাকে গ্রেফতার করে তাদের আনুগত্য না করা পর্যন্ত শাস্তি দিবে শুধু তার জন্য মৌখিকভাবে কুফরী শব্দ উচ্চারণ করা বৈধ হবে। তবে তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকবে। আলিমরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত (ইজমা) হয়েছেন যে, যদি কৌতুকের ছলে কুফরী কালাম বলে তাহলে তাকেও কাফির বলা হবে। তাহলে যে ভয়ে বা পার্থিব জীবনের মোহে কুফরী কালিমা বলবে তার অবস্থা কি হবে!"

এরপর তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বিশটিরও বেশি দলিল দিয়েছেন। এ জন্য তার বইটি "*আদ-দালা'ইল* (দলীল সমগ্র)" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যারা দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা এসব চিন্তা করে দেখুন। বিশেষ করে যারা মানব রচিত আইনে সন্তোষ প্রকাশ ও তাদের আইন, সরকার ও সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করে তারা যেন ভেবে দেখে এ ব্যাপারটি তাদেরকে বেশী উদ্বিগ্ন করছে। বিশেষ করে মিশরীয় প্রত্যেক সামরিক পদস্থ কর্মকর্তারা যখন নাজদে শাঈখ হামদ বিন আতীক ও শাঈখ সুলাইমানদের আমলে নজদে প্রবেশ করে তখন তারা '*সাবিল আন-নাজাত ওয়াল ফিকাক*' ও '*আদ-দালা'ইল*' গ্রন্থ দুটি রচনা করেন, যেন মানুষ ঐ সামরিক লোকদের সমর্থন দেওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে যারা অনেক বিদ'আত, কুসংস্কার, কবরের শিরকের প্রচার করত (দেখুন - আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ৩০৯ ও অন্যান্য পৃষ্ঠায়, জিহাদ খণ্ড)।

তৎকালীন শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের বংশধর নাজদী আলেমদের ও তাদের অনুসারীদের জানা যায় যে, তারা মিশর ও তুর্কী অনুগত সামরিক বাহিনীকে কাফির বলে অভিহিত করতেন। যা তাদের অনেক বইতে বলেছেন। বরং তাদেরকে যারা সমর্থন করত অথবা আনুগত্যে প্রবেশ এবং তাদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করত বা অন্তরে মু'মিনদের বাদ দিয়ে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত তাদেরকে কাফির বলতেন। এখন যে প্রশ্নটি করতে ভীতরা পীড়া পীড়ি করে তা হলো, শিরকী ও বিদ'আতী অন্তরের রাষ্ট্রের অনুগত হওয়ার কারণে তৎকালনি মিশরকে তারা কাফির রাষ্ট্র বলে মনে করতেন। তখন সেখানে বর্তমানের চাইতেও বেশি মুসলিম ছিল। যে তাদের সমর্থন করত, ভালবাসত এবং তা প্রকাশ করতে পছন্দ করত তাদের বিরুদ্ধে যদি তাঁরা এ ধরনের লিখে থাকেন, আর বর্তমানে আধুনিক যুগে যারা মানব রচিত আইনের পক্ষে কথা বলে তাদের অবস্থা কেমন হবে বলে মনে করেন?

যারা বাড়ী, ব্যাংক, চেক (একাউন্ট), চাকুরী অথবা এ ছাড়া পার্থিব জীবনের অন্য কোন ভোগ্যপণ্য থেকে বঞ্চিত বা হারানোর ভয়ে তাদের সামরিক, পুলিশ ও আদর্শকে সমর্থন করে তাদের ব্যাপারে কেন তারা তরিৎ সিদ্ধান্ত দিতেন? এবং কেন তাদের প্রতি যারা একনিষ্ঠতার শপথ করত অথবা তাদের আইন কানুনকে সমর্থন করত তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিতেন। আর তারা যদি এযুগ পেতেন তাহলে কেমন হতো? ভয় করুন, হে বিবেকবানরা! তাওবা, তাওবা করুন হে অবহেলাকারীরা! কেননা দ্বীনের শাখায় নয় মূলে ফিতনা শুরু হয়েছে। তাই আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী, সম্পদ, ব্যবসা, বাসস্থান হতে হবে দ্বীন (দ্বীন) কে রক্ষাকারী এবং এগুলোর বিনিময়। আর পার্থিব এ বিষয়গুলোকে রক্ষা করতে যেন দ্বীনই বিনিময় না হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

(হে নবী) আপনি বলে দিন তোমাদের পিতাগণ, সন্তানরা ভাইয়েরা, স্ত্রীরা, আত্মীয়স্বজন, উপার্জন করা সম্পদ, ব্যবসার লাভের আশঙ্কা এবং প্রিয় বাসস্থান যদি আল্লাহ ও রাসূল এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়। তাহলে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন না। (আত্-তাওবাহ্ ৯ঃ ২৪)

এজন্য বিচক্ষণ হোন এবং এগুলোকে ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় সংগ্রাম করাকে ঐ আটটি বস্তুর চাইতে অধিক ভালবাসাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। এগুলোর কোন একটি বা একাধিক জিনিস অথবা এর চাইতে নগণ্য কোন জিনিসই যেন বেশি মর্যাদাকর ও মূল্যবান না হয়ে উঠে। আপনার কাছে দ্বীনই যেন সবচেয়ে ও সর্বোচ্চ মূল্যবান জিনিস হয়। (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১২৭ জিহাদ খণ্ড)

অনুচ্ছেদ ঃ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমকে ধ্বংস করতে এবং দা'য়ীদের এই মিল্লাত থেকে সরিয়ে নিতে ত্বগুতী কার্যক্রমের কিছু পদ্ধতি

আপনি যখন মিল্লাতে ইব্‌রাহীম ভালভাবে বুঝেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে, এটি রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের নীতি এবং এ হচ্ছে সাহায্য, বিজয় ও উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভের পথ। তাহলে ভালভাবে জেনে রাখুন, প্রত্যেক যুগের আল্লাদ্রোহী শক্তি (ত্বগুতরা) এটা কোনদিনও মেনে নেয়নি। বরং তারা এ মহান মিল্লাতকে ভয় পায় এবং এর জন্য ভীতু, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে একে হত্যা করতে ও দা'য়ীদের অন্তর থেকে এই মিল্লাত বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতিতে মুছে ফেলার।

যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রাচীন যুগ থেকেই তাদের এ তৎপরতা সম্পর্কে সূরা কালামে মাক্কীতে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

তারা আশা করে যদি তোমরা নমনীয় হও (আপোষ কর) তবে তারাও নমনীয় হবে।
(কালাম ৬৮ঃ ৯)

তারা আশা করে দা'য়ীরা বক্রপথে চলুক এবং সুদৃঢ় সঠিক আম্বীয়ায়ে কিরামদের দাওয়াতী পদ্ধতি থেকে সরে দাঁড়াক। তারা দা'য়ীদেরকে এ সঠিক পথ থেকে সরানোর জন্য পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করা থেকে কখনো বিরত থাকে না। যেমন তাদের অনেক বাতিল সম্পর্কে চুপ থাকা এবং তাদের ভয়াবহতাকে মেনে নেওয়া অথবা তাদের কোন কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। এমনি করে দাওয়াতের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং দা'য়ীরা তাদের সরল সঠিক স্পষ্ট রেখা থেকে সরে পড়বে আর ত্বগুতরা জানবে এটি তার পশ্চাতগামী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ধারাবাহিকভাবে সে পা বাড়াবে। এভাবে পশ্চাতে যেতে যেতে এক সময় দা'য়ীরা মূল দাওয়াতের পদ্ধতিই ভুলে যাবে। এ পথচুত্যি নিশ্চিত হবে বাতিলপন্থীদের অনেক বা কিছু বাতিলের সমর্থন করা ও মেলামেশার কারণে। এটি হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যা তারা শুরু থেকে আশা করে থাকে। এ জন্যই যদি তাদের প্রতি এ দা'য়ীদের পদস্খলন ও পশ্চাতগামিতা প্রকাশ পাবে তখন দেখা যাবে তারা ও তাদের দাওয়াতে সন্তোষ প্রকাশ করে, তাদেরকে সান্নিধ্য নেয়, তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে, তাদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে তারা তোমার পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল, যাতে তুমি আমার সম্মন্ধে উহার (ওহীর) বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর;তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করত।
(বানী ইসরাঈল ১৭ঃ ৭৩)

এ আয়াত সম্পর্কে সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ) বলেছেন, রাসূলের (সঃ) সাথে দ্বীনের বিষয় ও দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে মুশরিকদের দরকষাকষির প্রয়াসের কথা বর্ণনা করার পর তাদের সে দরকষাকষির একটি হলো, তাদের উপাস্যকে তিরস্কার করা ছেড়ে দিতে এবং তার পূর্বপুরুষরা যে দ্বীনের অনুসারী ছিল তার সমালোচনা বন্ধ করার প্রস্তাবসহ আরো এ জাতীয় অনেক ।

তিনি বলেন, "এ ধরনের প্রয়াস থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বাঁচিয়েছেন আর এগুলোই হচ্ছে সার্বক্ষণিক রাষ্ট্র প্রধান ও চামচাদের দা'য়ীদের সাথে দরকষাকষির প্রয়াস । প্রয়োজনে তারা প্রবন্ধ তৈরি করে পথচ্যুতি করার প্রয়াস চালায় । যদিও তারা দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার ও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সামান্যই । তারা মধ্যম মানের প্রয়াসের বিনিময়ে অঢেল সম্পদ দিয়ে প্রলুব্ধ করে থাকে । আর দা'য়ীদের যারা এ টোপ গিলে ফিতনায় পড়ে তারা দাওয়াত থেকে সরে পড়ে একে সহজ ব্যাপার মনে করে । সুলতানের আমলারা তাকে সম্পূর্ণভাবে দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দিতে বলে না । তারা চায় দুই পক্ষকে খুশি রেখে মাঝামাঝি পন্থায় দা'য়ীরা দাওয়াত দিক । আর এ ছিদ্র দিয়েই রাষ্ট্রপতি দা'য়ীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং বলেন, ভাল দাওয়াত রাষ্ট্রপতির লোকেরই অর্জন । যদিও তারা একদিক দিয়ে বাদ পড়ে যায় । কিন্তু প্রথমেই সামান্যপথ বিকৃতি পরবর্তীতে পরিপূর্ণ পথচ্যুতি হতে সহায়তা করে । আর যে দা'য়ী দাওয়াতের কোন অংশের হ্রাস যদিও সহজ হোক মেনে নেয় । কোন কাজকে অবহেলার কারণে বাদ দেয় চাই সে নগণ্য হোক, তাহলে সে প্রথমে যে রকম সঠিক অবস্থায় ছিল সে আর প্রথমাবস্থার মত ফিরে আসতে পারবে না । কেননা কাটছাট করার স্বীকৃতি দেওয়ার অভ্যাস যতই বাড়ে সে ততই পশ্চাতগামী হয় । রাষ্ট্র প্রধানের লোকেরা দা'য়ীদের ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করে । যখন তারা (দা'য়ীরা) দ্বীনি ক্ষেত্রে আংশিক ছাড়কে স্বীকৃতি দিবে তখনই তাদের প্রভাবে রক্ষণশীলতা শেষ হয়ে যাবে । তখনই আমলারা বুঝতে পারবে দরকষাকষির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উচ্চ মূল্য দেওয়ার সময় শেষ এবং সরকারী আমলারাও দাওয়াতী দলে অন্তর্ভুক্ত হবে । আর দাওয়াতী কাজে সরকারী আমলাদের সহযোগিতা নেওয়া ও তাদের উপর নির্ভর করা আত্মীক বিপর্যয় । দাওয়াতী ক্ষেত্রে মু'মিনরা কেবল এক আল্লাহর উপরই নির্ভর করবে । আর যখন (আপোষ করার মাধ্যমে) পরাজয় দা'য়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে আর কখনো এই বিপর্যয় বিজয় হিসাবে ফিরে আসবে না!"

হ্যাঁ, আমরা আজকাল অনেক দা'য়ীকে দেখি যাদেরকে ত্বগুতরা অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে । তারা তাদের ক্ষতিও করে না অথবা তাদের সাথে শত্রুতাও করে না । যেহেতু ঐ দা'য়ীরা তাদের অনেক বাতিলের প্রতি সমর্থন দিয়েছে এবং তাদের সাথে মধ্যম পন্থায় মেলামেশা করে । তারা তাদের সাথে বৈঠক মিটিং অনুষ্ঠানে বসে এবং এ ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের আধুনিক যুগে দা'য়ীদেরকে সঠিক পথ থেকে ত্বগুতরা সরিয়ে ফেলেছে ।

আর বর্তমান সময়ের কিছু পদক্ষেপের উদাহরণ ঃ

- অনেক ত্বগুতরা যে পার্লামেন্ট ও জাতীয় সংসদ, কংগ্রেস, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছি । সেখানে দা'য়ীদের বিতর্ক একত্রিত করার জন্য । দা'য়ী ও অন্যান্য লোকদেরকে সেখানে বসিয়ে এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করবে এবং তারা এদের সাথে মিশে যাবে, তাদের

মাঝের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। তখন কোন মাসআলাই তাদের সাথে বৈরিতা প্রকাশের অথবা তাদের আইন কানুন ও সংবিধান অস্বীকার করার অথবা তাদের বাতিল থেকে পূর্ণাঙ্গ মুক্তির আসল রূপে আসবে না। বরং সেগুলো হবে একে অপরের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে এবং দেশের কল্যাণে ও তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ও নিরাপত্তার জন্য একই আলোচনার টেবিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে করে। দেশের স্বার্থে তারা ত্বগুতী নিয়ম কানুন দ্বারা ফায়সালা করে। তারা তাদের প্রবৃত্তির কুফরী মতবাদ দ্বারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। এটি হচ্ছে আমাদের জীবনের লজ্জাজনক অবস্থা। যারা সালাফী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত অথবা সাইয়্যিদ কুতুব প্রমুখ লোকের দীক্ষা নিয়েছেন তারাই এ অপমানের সম্মুখিন হয়েছেন। এ ধরনের লজ্জাজনক অবস্থায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও ইদানিং ত্বগুতীদের সংবর্ধনা জানানোর জন্য করতালি দিচ্ছেন, তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দাঁড়াচ্ছেন এবং বিভিন্ন উপাধিতে তাদেরকে ভূষিত করছেন, তাদের প্রশাসন, সৈন্যবাহিনী ও নিরাপত্তার জন্য তাদের সাথে বন্ধুত্বের ঘোষণা দিচ্ছেন। তাদের মানব রচিত আইন ও সংবিধানের পবিত্রতার শপথ করছেন। এরূপ হাজারো কাজ। তাহলে তাদের দাওয়াতের আর কি বাকী রাখল? আমরা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি!

তাদের আরো একটি কৌশল হচ্ছে- এই ত্বগুতরা এই আলেমদেরকে তাদের বিরোধীদের সাথে বাকযুদ্ধের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করে তাদের সময় নষ্ট করে ও ব্যস্ত রাখে এবং যাদেরকে তাদের নিয়মনীতি ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ভয় দেখায় যেমন শিয়ারা অথবা অন্য যারা হুমকি দেয় তাদের সাথেই সময় পার হয়ে যায়। এ জন্য এ ত্বগুতরা প্রথমে এই উত্তেজিত ও রাগান্বিত আলেমদের স্মরণাপন্ন হয়। তারা এ গোমরাহী নীতিকে পছন্দ করে না, এ গোমরাহী নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে এ আলেমদেরকে সাহায্য করে।

তারা এই আলেমদের ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করে ধোঁকা দেয় এবং মুসলিমকে হত্যা করা হারামের কথা বলে এদেরকে আবার তাদের ভয়ে সহযোগিতা করে সাহায্য, অস্ত্রর যোগান, অর্থ দিয়ে ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। অতঃপর এ নিরীহ লোকগুলো তাদের ফাঁদে পড়ে এবং ফাঁদে ফেলে তাদের জীবন, হায়াত ও সময় এক শত্রুর বিরুদ্ধে আরেক শত্রুর সাহায্যের আহ্বানকে বানচাল করে দেয়। বরং তাদের অনেকেরই অবস্থা এ পর্যায় এসে পৌঁছেছে যে, নিকটতম ত্বগুতের প্রতি শত্রুতার মনোভাব শেষ হয়ে যায় এবং তাদেরকে বিশ্বাস করে সত্যবাদী মনে করে। এমনকি কখনো কোন একদিন তাদের সৈনিক ও তার একনিষ্ঠ সাহায্যকারী বনে যায় এবং তার রাষ্ট্রেরও অনুগত হয়ে পড়ে.... । তারা তাদের আয়ু বা জীবন তার সেবায়, বিচার ও রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করার কাজ অনুভব করে অথবা অনুভব করতে পারে না। তারা আল্লাহর সৎ বান্দার এ কথাটি বুঝতে পারে না ঃ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার উপর অনুগ্রহ করেছো। তাই আমি কখনো পাপীদের সাহায্যকারী হব না। (আল-কাসাস ২৮ঃ ১৭)

ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ আয়াতটি সম্পর্কে ইসরাঈলী ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ "যে ইসরাঈলী মূসা (আঃ) এর কাছে কিবতীদের সাথে ঝগড়ার সময় সাহায্য চেয়েছিল সে ছিল কাফির। তাকে তাঁর সম্প্রদায়ের বলার কারণ হলো, সে একজন ইসরাঈলী বংশদ্ভুত ছিল। সে তাঁর দ্বীনের অনুসারী ছিল এমন কোন বর্ণনা নেই। এ জন্য মূসা (আঃ) লজ্জিত হলেন যে, তিনি একজন কাফিরকে সাহায্য করেছেন অন্য আরেকজন কাফিরের বিপক্ষে। তখন তিনি বলেছিলেন, এরপর আমি আর কোন কাফিরের সাহায্যকারী হব না। তারা আল্লাহর একথাও বুঝতে সক্ষম হয়নি ঃ

হে বিশ্বাসীরা! যে সমস্ত কাফিররা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এবং এ ব্যাপারে যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়... (আত্-তাওবাহ ৯ঃ ১২৩)

তারা যখন এ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে, আর ঐ শিয়া বা অন্যরা যদিও ইসলামের ও মুসলিমের শত্রু তাই তাদের সাথে শত্রুতা, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা তাদের বাতিলকে অস্বীকার করাও কাম্য। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে শুরু করে তার পরের গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে হবে এবং সবচেয়ে নিকটের কাজ সেরে তার পরবর্তী নিকটতম কাজ করতে হবে।

এ ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বজন জ্ঞাত যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনীতে বরং সঠিক বিবেক ও এর উল্টাটাকে অস্বীকার করবে। কেননা অধিক নিকটস্থ বস্তুর ভয়াবহতার প্রভাব, বিশৃঙ্খলা, ফিতনা দূরতম বস্তুর চেয়ে বেশী বড় ও কঠোর শক্তিশালী। এ জন্য সাধারণভাবে আত্মা ও শয়তানের সাথে জিহাদ করতে হবে শত্রুর সাথে জিহাদের আগেই। এজন্যই রাসূল (সঃ) প্রথমেই পারস্য বা রোম বা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেননি, নিজের আশে পাশে যারা আছে তাদের অবজ্ঞা করে।

- বরং কখনো অনেক ত্বগুত এই ভয়ানক পিচ্ছিল পথে বিনিয়োগ করে বিনিময়ে এ ধরনের অনেক মূর্খ আলেমদের বশ করে ফেলে। অনেক দা'য়ীকে প্রচার কার্যে বাধা দেয়ার জন্য এদের কাজে লাগানো হয় অথবা ইসলামী জোট হতে বের করার কাজেও যারা ঐ আলেমদের প্রতিপক্ষ দলে অথবা মাযহাবে বা তরীকায় থেকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছে তাদেরকে। কখনো ঐ আলেমদের কাছ থেকে এদেরকে দমন করার জন্য ফতোয়া আদায় করা এবং তাদের ও তাদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এ ফতোয়া এই বলে কাজে লাগানোর জন্য যে, তারা খারেজী অথবা দ্বীনত্যাগী ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল সৃষ্টিকারী লোক এবং তারা দলীল হিসেবে ব্যবহার করেঃ

সাবধান! এরাই হচ্ছে বিশৃঙ্খলাকারী (ফাসেক)... (আল-বাকারা ২ঃ ১২)

অথচ তারা এদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ও অনুভব করে । এ ধরনের লজ্জাজনকর পরিস্থিতি আমাদের বর্তমানে প্রায়ই দেখা যায় তবুও এ অধম উলামারা বা তাদের দা'য়ী ভাইয়েরা পথচ্যুতির কোন পর্যায়ে পোঁছেছে তা অনুধাবন করে না । এ বিপথগামিতা মূর্খতা অথবা অপব্যাখ্যার কারণে হয়ে থাকে । এমনকি যদিও তারা জ্ঞানের ও সন্ধানের উপর অটল থাকে তবে তারা ত্বগুতদের সমান পথচ্যুত হবে না এবং আল্লাহর ও তাঁর দ্বীনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সমপর্যায় হবে না ।

- কাফের কর্তৃক দা'য়ীদের পথচ্যুতি করার আরো একটি পদ্ধতি হলো মু'মিন ও দা'য়ীদেরকে পদ, কর্মস্থল চাকুরী, উপাধি প্রভৃতি দ্বারা প্রলুব্ধ করে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ ও বাসস্থান প্রদান করা । তাদের প্রাচুর্য্য দান করা । আর এধরনের পদ্ধতির দ্বারা তাদেরকে বশীভুত, শৃঙ্খলিত ও মুখে তালা লাগিয়ে দেয় । যাতে তাদের সাথে তাদের জনৈক ব্যক্তির কথার প্রতিফল দেখা যায়ঃ "যে স্তন তোমাকে দুধ পান করায় তাকে কামড় দিও না ।"

  এভাবেই এই দা'য়ী ও আলেমগণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তাদের রাষ্ট্রের সরকারের প্রতি । তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পোঁছে যে তারা বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া দিয়ে ঐ সকল সীমালঙ্ঘনকারী শাসকদের বাতিলপন্থার অনুমোদন দেয় ।

আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম "তালবীসু ইবলিস" নামক পুস্তিকার **১২১** পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ "ফকীহদের উপর ইবলীসের সংশয় ঢুকার আলামত হলো, তাদেরকে আমীর সুলতানদের সংশ্রবে আসা এবং তাদের চাটুকারিতা করা, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাদের অপরাধকে প্রতিহত না করা ।" তিনি **১২২** পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "মোট কথা, সুলতানদের দরবারে যাওয়া মহা বিপদ । কেননা প্রবেশের প্রথম দিকে উদ্দেশ্য (নিয়্যাত) ভালই থাকে । পরবর্তীতে তাদেরকে সম্মান, উপহার দেয়া, কুর্ণিশ করা অথবা তাদের মধ্যে থাকার লালসা একে পরিবর্তন করে ফেলে । চাটুকারিতা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে ও তাদের মন্দ কাজকে প্রতিবাদ করা অভ্যাস আর থাকে না । সুফিয়ান সাওরী বলতেন, "আমি সুলতানদের অপমান করতে যতটুকু ভয় না পাই তার চেয়ে বেশি ভয় পাই তাদেরকে সম্মান করতে । কেননা এজন্য আমার মন তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে ।" যদি জ্ঞানী লোক ঐ লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতেন যাদের অন্তর সুলতানদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার ভয় করতেন, তাহলে এ দা'য়ী ও ত্বগুতদের মাঝে আমাদের সময়ে বিশাল দূরত্ব দেখা যেত । আল্লাহ তাকে দয়া করুন, যিনি বলেছেন ঃ

সে আলেমের চেয়ে অন্য কেউ অধিকতর মন্দ ব্যবসা করে না
যে অজ্ঞদের মত দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ।
সে তখন *সাবা*'র হাতের মত তার দ্বীনকেও বিভক্ত করতে থাকে
এবং (দ্বীনকে) অবজ্ঞা করে সম্পদ লাভের প্রবল আগ্রহের কারণে ।
যে তার রব্বকে স্মরণ ও ভয় করল না
তাহলে তার দুই হাত ধ্বংস হল ও তার সম্পদ হারালো ।

- আরেকটি পদ্ধতি হলো, কোন কোন ত্বগুত দ্বীনের শাখা প্রশাখার ও দাওয়াতী কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এর দ্বারা অনেক দা'য়ী ও আলেমদেরকে ধোঁকা দেয় যাদের ইখলাস তথা ন্যায়-নিষ্ঠতাকে তাগুত ভয় পায় এবং যারা মানুষের কাছে প্রিয়। তারা তাদের জন্য শিক্ষালয় কোর্স ও রেডিও-টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করে দেয়। তাদেরকে ওয়াকফ শরীয়াত ও বিশ্বকোষের ও অন্যান্য কাজে মন্ত্রণালয়ে ব্যস্ত রাখে যাতে করে এই ত্বগুতদের শয়তানী ও ফাসিকী কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

এছাড়াও ত্বগুতেরা ইসলামের নামে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যেমন, "*রাবেতা আলম আল-ইসলামী* (বিশ্ব মুসলিম লীগ)" নামক সংস্থাটি আমাদের অনেক অসহায় আলেমদের সেখানে সদস্য হওয়ার ব্যাপারে প্রতারিত হয়, যদিও জানে যে এগুলোর সদস্য হওয়ার অর্থ হলো এই অন্ধকার পথে ত্বগুতের সাথে ঘনিষ্টতা করা। বিশেষ করে সৌদি সরকারের ত্বগুতদের আজ্ঞাবহ সংস্থা, এমনকি একটি কলাম বা গ্রন্থ প্রকাশ করলে সে গ্রন্থটি ঐ রাষ্ট্রের মুনাফিকী ও চাটুবৃত্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। আপনাকে এর সাথে এবং এর দায়িত্বশীলদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের ত্বগুতদের সাথে তার যে কর্মসূচী আছে সেখান থেকে বিরত থাকতে বলতেছে এবং এর উল্টা করা, ঐগুলোর কোন দেশের অনুগত মূলত মূল দেশের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার শামীল।

যখন কোন ত্বগুত কোন রাষ্ট্র ও সেখানকার ত্বগুতদেরও রাষ্ট্রনীতির উপর আক্রমণ করে, যেমন একসময় গাদ্দাফীর সাথে সউদী সরকারদের শত্রুতা ছিল, তখন ফতোয়া ও নিন্দার ঝড় উঠে যায়। কিন্তু যখন, এই বিরোধ মিটে তখন ঐ ফতোয়াগুলো শান্ত ও নির্বাক হয়ে পড়ে। আর সে ব্যাপারে কিছুই শোনা যায় না, যদিও ঐ ত্বগুতদের অবস্থানের কোনই পরিবর্তন হয় নি। বরং, অতীতের চাইতে আরো খারাপ ও ক্ষতিকর হয়ে পড়েছে। আর যদি তারা তাদের নিজ চোখ দিয়ে এসব অপবিত্র ও যালেম তাগুতদের কা'বা তাওয়াফ করতে দেখে, তখন সেই আলেমরা কোনই বিরোধিতা করে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আমরা আমাদের এই বিপদের কথা বলি। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এই সংস্থা ও অনুরূপ সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান না হয়ে পারে না আর আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে রাষ্ট্রের সরকার থেকে যা বলা হবে তাই আমরা বিশ্বাস করব ও প্রচার করব। কত ভাল একটি প্রথা!

- তাদের ইসলাম রোধের আরেকটি পদ্ধতি হলো, তারা অনেক দা'য়ীকে দাওয়াত, খুতবা দেওয়ার অনুমোতি ও "সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ" করার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দেয়, যেগুলোর মাধ্যমে তারা ঐসকল আগ্রহী দা'য়ীদেরকে শান্ত ও তাদের বশ করে রাখতে পারে। এবং একই সময়ে সরকার ও তাদের অসৎ, মন্দ ও বাতিল পন্থা এবং নিজ আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করার যে সবচেয়ে বড় অন্যায় সে সকল কাজে বাধা দেওয়া থেকে বিরত রাখে। এবং তারা এটা করতে সক্ষম হয়, সাধারণ (ব্যাপক) কয়েকটি অন্যায় নিয়ে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে, যে অন্যায় কাজে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং ত্বগুতী প্রশাসনের ক্ষমতায় থাকা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এবং তারা (আলেমরা) তাদের "অন্যায় কাজে নিষেধ" এর কার্যক্রম উচ্চতর ও আরও গুরুতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে করতে পারে না যতক্ষণ তারা নিজেদেরকে ঐসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রাখে যেগুলো তাদের কর্মকান্ড ও দাওয়াহর পরিচালনা করার মাধ্যমে তাদের একটি গন্ডির মধ্যে বেধে রাখে।

- আরো একটি পদ্ধতি হলো, কাফির কর্তৃক মুসলিম প্রজন্মের যুবকদের অন্তরেই মিল্লাতে ইব্‌রাহীমকে ধ্বংস, নষ্ট ও হত্যা করে, কাফির কর্তৃক তাদের স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া (প্রযুক্তি) ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ত্বগুতী সংগঠনের দ্বারা। এমনকি এই ত্বগুতেরা ফিরাউনের চাইতেও বেশী দুর্ষ্কমা ও তার চাইতেও বড় ষড়যন্ত্রকারী। তারা কোন মুসলিম সন্তানকে হত্যার পরিকল্পনা করে না, বরং তারা তাদের বিভিন্ন রকম কৌশল প্রয়োগ করে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমকে তাদের অন্তর থেকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেই কেবল শেষ পরিস্থিতিতে হত্যা করে। যেমনটি এর বিপরীতে ফিরাআউন মুসলিম প্রজন্মকে জন্মের সাথে সাথেই হত্যা করেছিল। তারা তাদের অন্তর থেকে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমকে হত্যা করে তাদেরকে ধ্বংস করে থাকে। এটি তারা করে ঐ মুসলিম প্রজন্মকে তাদের প্রতি ভালবাসা, সমর্থন, তাদের আইন কানুন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য। তারা এ কাজ করছে ধ্বংস সাধনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যাবস্থাপনা দ্বারা যা অনেক মূর্খ মুসলিম নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায় বিনিময়ে এই ত্বাগুত তাড়াহুড়া করে প্রকৃত হত্যা করার বদলে মানুষকে নিজের প্রভাবে রাখে, তারা এ অপবিত্র রাজনীতির অনুসরণ করে। আর মানুষ তাদের প্রশংসায় ও গুণগান করে বলে, তারা নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষা ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। এসবের উপর এবং এ টোপের নীচে মুসলিম প্রজন্মকে তাদের অনুগত, বাধ্য এবং তাদের প্রশাসন ও আইনের একনিষ্ঠ সেবক বানিয়ে নেয়। অথবা একেবারে সবচেয়ে কম অবস্থা হলে তারা প্রতিপালন করে একটি দ্রবীভূত মূর্খ ও পথচ্যুত প্রজন্মকে। যারা এই কঠিন দাওয়াত ও মজবুত মিল্লাত থেকে বিমূখ ও বাতিলপন্থীদের তোষামোদকারী। তারা শক্তিশালী হবে না এবং তাদের এ দিকগুলো সংশোধিতও হবে না আর তারা এতে কোন চিন্তা ভাবনাও করবে না। আমরা তাদের এ কর্মসূচী ও তাদের দুষকর্ম নীতি - "*ই'দাদ আল-ক্বদাতআল-ফাওয়ারিস বি হাজরি ফাসাদ আল-মাদারিস*" (আগামী দিনের অগ্রগামী যোদ্ধাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অসাধু শিক্ষা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রস্তুতি) পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

কত দা'য়ীই পতিত ও নিক্ষেপিত হয়েছে পিচ্ছিল পথে। আর আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যা ইসলামী নেতৃত্ব ও আলেমদের প্রতি মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। শুধু এই পিচ্ছিল পথেরই অবদানে এবং কত দা'য়ী নিজেদেকে ত্বগুতের কাছে ছোট করে ফেলে তাদের অন্তর থেকে তার ভয় মেরে ফেলেছে। সেজন্য তাকে ও তার দাওয়াতকে তারা ভয় করে না এবং তাকে কোন গণনায়ই ধরে না। অতঃপর যখন তার মাঝে কঠোরতা ও দূরবর্তীতা দেখে, পাহাড়ের মত দৃঢ়তা, বৈরিতা, ঔদ্ধত্য ও সাহসিকতা এবং তাদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত দেখে থাকে, তাদের তরীকার এই দাওয়াত পরিপন্থী যে কোন অনুষ্ঠান থেকে তখন তার জন্য হাজারো হিসাব করে এবং আল্লাহও ত্বগুতদের অন্তরে ভয় ভীতি ঢুকিয়ে দেন। যেমনি কাফিরদের অন্তরে নবী (সঃ) এর ভীতি ছিল। যেমনিভাবে তাকে এক মাসের দূরত্বে অবস্থান করা সত্ত্বেও কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে সাহায্য করেছিলেন।[২৭]

---

[২৭] **দ্রষ্টব্যঃ** জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, *রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমাকে এমন পাঁচটি জিনিষ দেয়া হয়েছে যা আগে কাউকে দেয়া হয়নিঃ (১) আমাকে শুধুমাত্র ভয়ের মাধ্যমেই এক মাসের দূরত্বে থেকে বিজয়*

তাই এ পিচ্ছিল পথ থেকে সাবধান থাকুন এবং বেঁচে থাকুন ও সাবধান হোন ত্বগুতের ক্রীড়ানকে পতিত হওয়া থেকে ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নকশার কথা বর্ণনা করে এবং আমাদেরকে তার স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন এবং সেখান থেকে সাবধানও করেছেন আমাদের সমাধান ও চিকিৎসা দিয়েছেন, আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, তাঁর একথার পূর্বেই ঃ

তারা আশা করে তাদের সাথে তোষামোদ করা হোক তাহলে তারাও করবে ।
(কালাম ৬৮ঃ ৯)

সরাসরি আল্লাহ বলেছেন ঃ

মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য কর না । (কালাম ৬৮ঃ ৮)

তাদের অনুসরণ কর না, তাদের দিকে ঝুঁকে পড় না, তাদের নিরপেক্ষ সমাধান গ্রহণ কর না । কেননা আপনার রব আপনাকে সত্যদ্বীন দিয়েছেন এবং আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের হিদায়াত দিয়েছেন, এ রকম সবই পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন ।

- আর যথার্তভাবে, মক্কায় অবস্থানকালে সূরা *আদ্‌-দাহর*-এ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

অতএব আপনি আপনার রবের আদেশে জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং তাদের কোন পাপী বা কাফিরের আনুগত্য করবেন না । (আদ্‌-দাহর ৭৬ঃ ২৪)

এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুস্কৃতকারী কাফিরদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন । এই পথ দা'য়ীদের নিজেদের মনগড়া কোন পথ নয়- তারা ইচ্ছামতো এই পথকে পরিবর্তন করার বা এর কোন বৈশিষ্ট্য বদলে দেবার অধিকার রাখেনা । বরং এটা হলো ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মিল্লাত এবং অন্য সব নবী ও রাসূলের পথ, যার বর্ণনা কুরআনে আছে ।

দেয়া হয়েছে; (২) সমস্ত দুনিয়াকেই আমার জন্য ইবাদতের জায়গা করা হয়েছে-যেখানেই আমার উম্মাতের যে কেউ ইবাদত করতে চাইবে, সেখানেই সে করতে পারবে, (৩) গণীমতে মাল আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে যা আগে বৈধ ছিল না (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, (৫) অন্য নবীরা ছিলেন কেবল তাদের নিজ নিজ জাতির জন্য প্রেরিত, কিন্তু আমাকে প্ররণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য ।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাক্কী সূরা ফুরকানে আল্লাহর আরো একটি বাণী ঃ

অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর (কোরআন) দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করুন। (ফুরকান ২৫ঃ ৫২)

...এর (কোরআন) দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করুন... এর অর্থ হলো, কুরআন মাজীদ দ্বারা জিহাদ কর। কুরআন মাজীদে যে সকল দাওয়াতী পদ্ধতি বলা হয়েছে এর আর কোন রীতিনীতি ও পদ্ধতিকে বরাবর মনে করবেন না। কাফিরদেরকে কুরআন দ্বারাই ভয় দেখান এছাড়া অন্য কোন আঁকা বাঁকা পথের অনুকরণ করবেন না। যাতে কাফিরদের আনুগত্য নিহিত আছে অথবা তাদের বাতিল সম্পর্কে নীরবতা রয়েছে।

- অনুরূপ আল্লাহর আরেকটি বাণী ঃ নবী (সঃ)-কে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত[২৮] করার আদেশ দেয়ার পর বলেছেন ঃ

.

আমার স্মরণ থেকে যার অন্তরকে অচল করে দিয়েছি তাদের আনুগত্য করবেন না। সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে আর তার অবস্থান বাড়াবাড়িতে। বলে দিন সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে যার ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে, যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করতে পারে। (কাহফ ১৮ঃ ২৮-২৯)

এমনি আল্লাহর আরো একটি বাণী যা সূরা শুরা মক্কাতে নাযিল হয়েছে - নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) প্রমুখদের জন্য যে শরীয়াত দিয়েছেন সে কথা বলার পর বলেছেন,

---

[২৮] এখানে '*তিলাওয়াত*' অর্থ হলো 'অনুসরণ করা'। সুতরাং, যে কিছু 'তিলাওয়াত করল' এর অর্থ 'সেটা অনুসরণ করল'। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত হচ্ছে সেটি পড়া, শিক্ষা দেয়া, সেটিকে আঁকড়ে ধরা ও তার আদেশ মেনে চলা এ তরীকায় টিকে থাকার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এর সাথে আরো যোগ হয় তাহলোঃ সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ, মুরাকাবা করা, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আদ্-দাহারে সরাসরি বলেছেন ঃ

.

"সকাল সন্ধ্যা তোমরা রবের নাম স্মরণ কর। এবং রাতে সালাত পড় ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ কর।" (আদ্-দাহর ৭৬ঃ ২৫-২৬)

এজন্য আপনাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে দাওয়াত দিন, প্রতিষ্ঠিত হোন। তাদের প্রবৃত্তির অনুকরণ করবেন না... (শুরা ৪২ঃ ১৫)

এর একটু পরেই নবীকে আল্লাহ আদেশ করছেন কাফিরদেরকে বলতেঃ

আমরা আমাদের কাজ করব ও তোমরা তোমাদের। (শুরা ৪২ঃ ১৫)

অতএব বৈরিতা তাদের, তাদের প্রবৃত্তির ও পদ্ধতির ও তরীকার সাথে।

এরূপ আল্লাহর আরো একটি বাণী যা তিনি সূরা জাসিয়া মক্কায় নাযিল বলেছেন ঃ

.

অতঃপর আমি আপনাকে একটি কার্যকর শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। আপনি তারই অনুসরণ করুন। যারা অজ্ঞ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় অত্যাচারিরা একে অপরের বন্ধু, আল্লাহ মুত্তাকীনদের অভিভাবক। (জাসিয়া ৪৫ঃ ১৮-১৯)

আর এভাবে যদি আমরা কুরআনের আয়াত অনুসন্ধান করি তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বুঝার এমন আয়াত অনেকগুলো এমনকি একশোরও বেশি পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অযথা সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখেননি। এই মিল্লাতের পথ পরিক্রমা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এই লেখনি দা'য়ীদের জন্য যথেষ্ট হবে না?

অথবা রাসূল (সঃ) ও নবীগণ যাকে তাদের পক্ষ থেকে লম্বা করেননি তারা তা প্রশস্ত করবেন? অতএব এখন তাদের অবহেলা হতে জেগে উঠা উচিত। অথবা ত্বগুতের ক্রীড়নকে পতিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের যথেষ্ট হয়নি। এ সত্য গোপন করার জন্য মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা জিহাদ (সংগ্রাম) ও হায়াত নষ্ট করতে। আল্লাহর শপথ! যে কোন একটি পছন্দ করুন ঃ

"হয় আল্লাহর শরীয়ত অথবা অজ্ঞদের কুপ্রবৃত্তির যে কোন একটি। এখানে তৃতীয় কোন ফরজ নেই। অথবা সরল সোজা শরীয়ত ও প্রবৃত্তির মধ্যে কোন মধ্যমপন্থা নেই।"

"নিশ্চয় এ আয়াতগুলো দা'য়ীদের পথ ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এর প্রত্যেকটি কথা, এর ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে উপকৃত হবেন। এটি একটি শরীয়ত যা এগুণের অধিকারী। এ ছাড়া যা আছে তা সবই কুপ্রবৃত্তি, যার উৎস অজ্ঞতা। দা'য়ীর কর্তব্য হচ্ছে শুধু শারীয়াতের নীতি অনুসরণ করা এবং সমস্ত প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা এবং তার পরেও কর্তব্য হলো শারীয়াতের কোন বিষয় থেকে পথচ্যুত হয়ে প্রবৃত্তির কোন জিনিসের দিকে না যাওয়া। আর এই প্রবৃত্তির অনুসারীরা শারীয়াত পন্থীদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা করে। তাদেরকে কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করা যাবে না। তারা একে অপরের বন্ধু। তবু তারা সত্য দা'য়ীকে কোন ক্ষতি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। কষ্ট দেয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি তারা তাকে করতে পারবে না আল্লাহই তাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী। আল্লাহ্‌র সুরক্ষা ও সাহায্যের তুলনায় ঐসব তাগুতদের পারস্পারিক সহায়তা কিছুই না। আর শারীয়াহ আঁকড়ে রাখা দা'য়ী যে কিনা আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়েছে তার সামনে এইসব ভাড়গুলো কতোই না দুর্বল যাদের সাহায্যকারী কেবলমাত্র তারা নিজেরাই।"

"নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।"

আর এটিই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের তরীকা ...

বাস্তবায়ন করবে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি?

আবু মুহাম্মাদ

১৪০৫ হিজ্‌রী